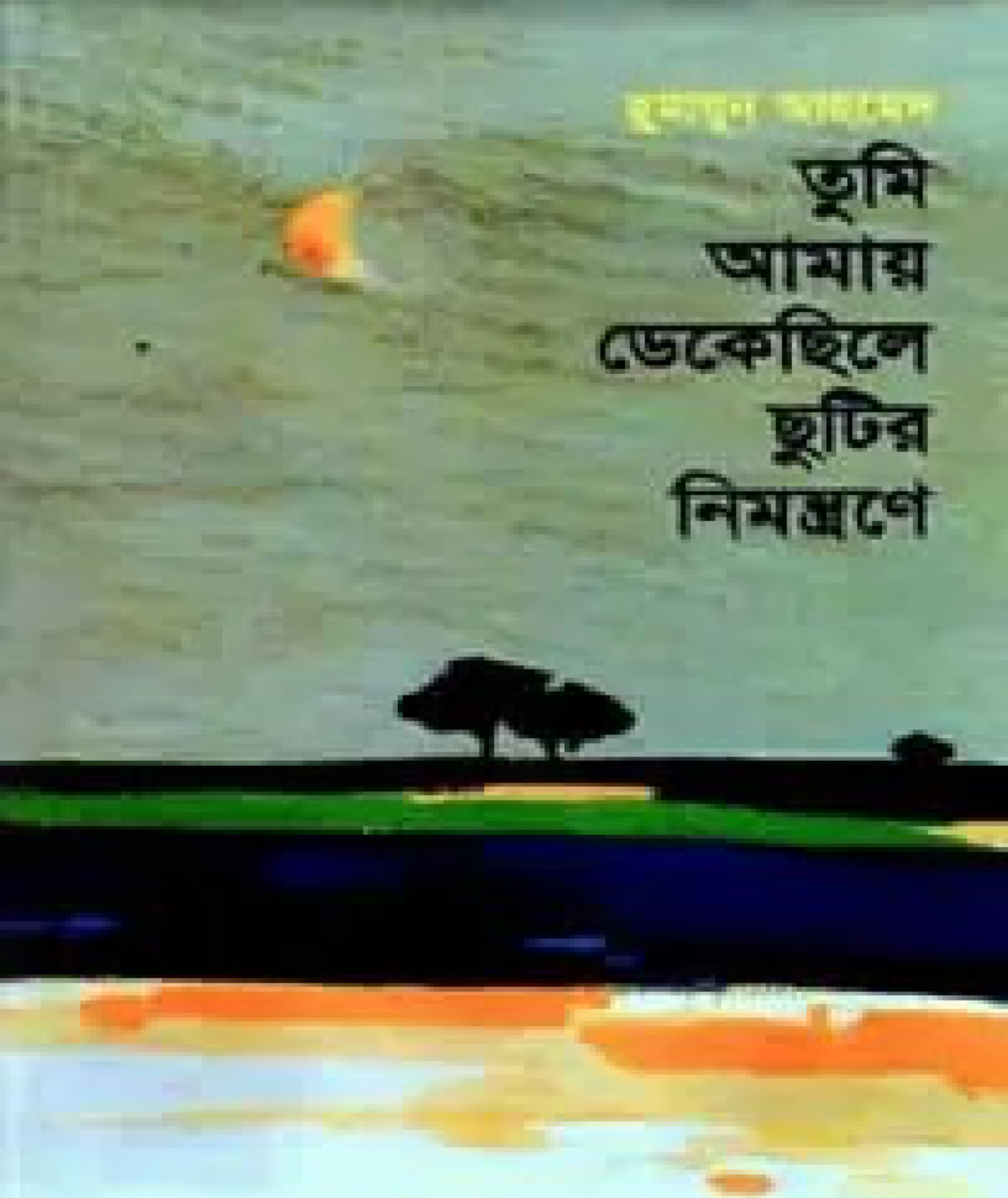
তুমি
আমায়
ডেকেছিলে
ছুটির
নিমন্ত্রণে

তুমি আমায় ডেকেছিলে ছুটির নিমন্ত্রণে

হুমায়ূন আহমেদ

আবেদন

নুক্, কিন্ডেল, কবো বা ট্যাব ছাড়া ই-বই পড়ার অদম্য আগ্রহ থেকেই এই ইপাব তৈরি যা খুব সহজেই হাতের স্মার্টফোনে যে কোন অবসরেই পড়ে ফেলা যায়। আলাদা করে ই-বুক রিডার কেনার কোন প্রয়োজন নেই বা পিডিএফের মত জুম করে ডান-বা দিকে সরিয়ে পড়ারও দরকার নেই।

কিন্তু অন্তর্জালে পছন্দের বাংলা বইয়ের পিডিএফ যাও বা পাওয়া যায়, ইপাব অপ্রতুল। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও প্রচারের জন্য তাই নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় (ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার, লিঙ্কডইন ইত্যাদিতে) এই ইপাব ছড়িয়ে দিতে হবে।

প্রচ্ছদ, প্রকাশনা, উৎসর্গ ও ভূমিকা (যদি কিছু থাকে) ইত্যাদি প্রথম দিকের পাতাগুলো দেখতে না পেলে ঠিক বই বই বুঝতে অসুবিধা হয়, তাই তথাকথিত এই অপ্রাসঙ্গিক পাতাগুলিও রাখা হয়েছে।

অন্তর্জাল থেকে পছন্দের বইয়ের পিডিএফ নামিয়ে টেক্সটে রূপান্তরিত করা- এ কাজে ভি-ফ্ল্যাটের এখনো কোন জুড়ি নেই। এবার একে ওয়ার্ড বা অন্য কিছুতে এডিট করে ক্যালিবার এর সাহায্যে ইপাব। এটাই সহজ পদ্ধতি।।

ভি-ফ্ল্যাটের সাহায্যে পিডিএফ থেকে তৈরি, ভুল থাকলে জানান। বইটির বিষয়বস্তু ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েবসাইটে প্রকাশ্যেই উপলব্ধ। সমালোচনা, মন্তব্য, প্রতিবেদন, শিক্ষাদান, বৃত্তি এবং গবেষণার মতো অলাভজনক শিক্ষামূলক বা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য, বাণিজ্যিকভাবে বিতরণের জন্য কখনোই নয়।

১

নবনী অনেকক্ষণ থেকে হাঁটছে। কতক্ষণ সে জানে না। তার হাতে ঘড়ি নেই। এ রকম অজ পাড়াগায়ে ঘড়ির দরকারও নেই। তবে গায়ে চাদর থাকলে ভালো হত। শীত লাগতে শুরু করেছে। কিছুক্ষণ আগেও শীত ছিল না, এখন ঝপ করে শীত পড়ে গেছে। নবনী মনে মনে বলল, 'বাহ্ আশ্চর্য তো!' মনে মনে বলার প্রয়োজন ছিল না, চেঁচিয়েও বলা যেত—আশপাশে কেউ নেই।

তার পরনে সবুজ রঙের সিল্কের শাড়ি। সিল্কের শাড়ি সে কখনোই পরে না। শীতের সময় সিল্ক পরলে গায়ে হিম হিম হয়—ভালো লাগে না। সবুজ রংটাও তার পছন্দ না। তার ধারণা, সবুজ গাছেদের রং—এই রং তাদেরই থাকা উচিত। সবুজ শাড়ি পরার পর তার নিজেকে খানিকটা গাছ গাছ মনে হচ্ছিল। এখন আর মনে হচ্ছে না। শীত লাগছে। গাছদের নিশ্চয়ই শীত লাগে না।

নবনী হাঁটতে হাঁটতে একটা বটগাছের কাছে চলে এসেছে। এটা যে একটা বটগাছ দূর থেকে বোঝা যায়নি। বেলা পড়ে এসেছে, চারদিক অস্পষ্ট, ছায়া ছায়া। নবনী এগুচ্ছিল পায়ে-চলা পথে। তার অভ্যাস মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁটা। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ সে গাছটার সামনে পড়ে গেল। অন্ধকারের মধ্যে হুলস্থুল একটা ব্যাপার। বিশাল ঝুরি নেমেছে চারদিকে। পুরো গাছটাকে মনে হচ্ছে প্রকাণ্ড এক পাহাড়। নবনী বাচ্চাদের মতো গলায় চেঁচিয়ে বলল, 'মিস্টার বটগাছ! আপনি কোত্থেকে এলেন?' মনের আনন্দে এখানে চেঁচিয়ে কথা বলা যায়। কেউ শুনে ফেলবে না এবং ভুরু কুঁচকে ভাববে না মেয়েটা পাগল নাকি?

সে চারদিকে তাকাল। কেউ কোথাও নেই। মাথার উপর কিছু পাখি উড়াউড়ি করছে। কী পাখি? 'কী আশ্চর্য, টিয়া!' নবনী আবারো চেঁচিয়ে বলল, 'টিয়া টিয়া, টিয়া!' কেউ শুনবে না। যত ইচ্ছা চেঁচানো যায়। আচ্ছা, এই জায়গাটা জনশূন্য কেন? মানুষজন তো নেই, গরুছাগলও নেই, কে জানে এই জায়গাটা হয়তো 'দোষী'। সব গ্রামে একটা 'দোষী' পথ থাকে। সন্ধ্যার পর ঐ পথে কেউ যায় না। একটা থাকে 'দোষী গাছ'। বেশিরভাগ সময়ই শ্যাওড়া গাছ। দোষী গাছের কাছে যাওয়াও নিষেধ। এই বটগাছটা আবার দোষী না তো!

নবনী বলল, 'মিস্টার বটগাছ, আপনি দোষী না নির্দোষ?'

সে উত্তরের জন্য অপেক্ষা করল। মাথার উপর দিয়ে ট্যাঁ ট্যাঁ শব্দ করে ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়া উড়ে যাচ্ছে। এত সুন্দর একটা পাখি এত বিশ্রী করে ডাকে! পাখি যত সুন্দর হয় তার ডাকও হয় তত কুৎসিত। চিড়িয়াখানায় একবার ময়ূরের ডাক শুনে তার হাত থেকে বাদামের ঠোঙা পড়ে গিয়েছিল।

নবনী এমনিতে বেশ ভীতু। ঢাকায় তাদের বাড়িতে রাতে ঘুম ভাঙলে মনে হয় খাটের নিচে কেউ এক জন বসে আছে। মশারির নিচ দিয়ে সে তার বরফশীতল হাত ঢুকিয়ে নবনীকে ছুঁয়ে দেবে। রাতে অন্ধকার ঘরে সুইচ জ্বালাতে গিয়ে তার সব সময় মনে হয় সুইচ বোর্ডে হাত দিতে গিয়ে সে অন্য এক জনের হাতে হাত দিয়ে ফেলবে। অথচ সম্পূর্ণ অচেনা এই গ্রামে অন্ধকার হয় হয় অবস্থায়ও তার এতটুকু ভয় করছে না। বরং মজা লাগছে। বটগাছটার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করছে। নবনী বটগাছের একটা ঝুরিতে হাত রেখে বলল, 'মিস্টার বটগাছ, এটা কি আপনার হাত, না পা? আপনার গায়ের চামড়া এত খসখসে কেন?'

নবনীর হঠাৎ মনে হল, আচ্ছা বটগাছটা যদি এখন কথা বলে ওঠে তাহলে তার কেমন লাগবে? সে কি ভয় পাবে? বটগাছটা যদি বলে, 'নবনী, এটা আমার হাতও না, পা-ও না। আমরা তো মানুষ নই যে আমাদের হাত-পা থাকবে। আমরা হচ্ছি গাছ।' তাহলে কি নবনী ভয়ে চিৎকার করে উঠবে? মনে হয় না। ভয় পেলে আগেই পেত। আচ্ছা, সে ভয় পাচ্ছে না কেন এটাও তো এক আশ্চর্য ব্যাপার। পরিবেশ মানুষকে বদলে দেয় হয়তো। ঢাকা শহরে সে ছিল দারুণ ভীতু একটা মেয়ে। এখানে অসম্ভব সাহসী এক জন, যে হেঁটে হেঁটে একা চলে এসেছে প্রকাণ্ড এক বটগাছের কাছে।

নবনী ঠিক করল, পুরো গাছটা একটা চক্কর দিয়ে সে যে পথে এসেছিল সেই পথেই ফিরে যাবে। ডাকবাংলোয় পৌঁছতে পৌঁছতে অন্ধকার হয়ে যাবে। তাতে অসুবিধা হবে না। একটাই পথ। তাছাড়া গতকাল পূর্ণিমা গেছে। আজো কিছুক্ষণের মধ্যেই চাঁদ উঠবে। গতকাল কুয়াশা ছিল, আজ কুয়াশা নেই। চাঁদ উঠলে চারদিকে ঝলমল করতে থাকবে। নবনী আগে লক্ষ করে নি হঠাৎ লক্ষ করল বটগাছের গুঁড়িটা বাঁধানো। চারদিকে ঝুরি নেমেছে বলে বাঁধানো গুঁড়ি চোখে পড়ছে না।

এমন জংলা জায়গায় একটা প্রাচীন গাছ কে বাঁধিয়ে রেখেছে? কেউ কি এখানে এসে বসে? এখন কি কেউ চুপচাপ বসে আছে? নবনীর হঠাৎ একটু ভয় ধরে গেল। গা কেঁপে গেল। দ্রুত অন্ধকার হয়ে আসছে। গাছটাকে এখন আর ভালো লাগছে না। টিয়া পাখির শব্দ কানে বাজছে। মনে হচ্ছে এরা এখন অনেক নিচু দিয়ে উড়ছে। একটা পাখি তো প্রায় নবনীর মাথার চুল ছুঁয়ে গেল। নবনীকে দেখে পাখিগুলো কি বিরক্ত হচ্ছে? আচ্ছা কেউ কি নিশ্বাস ফেলল? নবনী পরিষ্কার নিশ্বাস ফেলার শব্দ শুনল। তার নিজের নিশ্বাস ফেলার শব্দই কি সে শুনেছে? নবনী দাঁড়িয়ে পড়েছে। তার মনে হচ্ছে সে একা একা আর ডাকবাংলোয় ফিরতে পারবে না। তার সব সাহস চলে গেছে। এখন হয়তো সে পথই খুঁজে পাবে না। বটের ঝুরির আড়াল থেকে কে যেন কাশল। একবার না, পরপর দুবার। নবনী দারুণ চমকে বলল, ‘কে? কে ওখানে?’

গাছের বাঁধানো গুঁড়িতে পা তুলে গুটিসুটি মেরে কে যেন বসে আছে। তার গায়ের চাদরটা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে— খয়েরি। নবনী উঁচু গলায় বলল, ‘কে ওখানে বসে আছে?’

‘জ্বি আমি।’

‘বের হয়ে আসুন দয়া করে।’

লোকটা যদি জবাব দিতে আরেকটু দেরি করত তাহলে কী কাণ্ড হত কে জানে। নবনী হয়তো হার্টফেল করত। গাছের ঝুরির ভেতর দিয়ে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে লোকটা বের হচ্ছে। দেখে ভয় পাওয়ার মতো চেহারা না। পঁচিশ-ত্রিশ বছরের এক জন মানুষ পরনে পাজামা পাঞ্জাবি। গায়ে খয়েরি রঙের চাদর। চোখে চশমা। তাকে দেখে মনে হচ্ছে—নবনী যেমন ভয় পেয়েছে, সেও ভয় পেয়েছে। কেমন মুখ কাঁচুমাচু করে, খানিকটা কুঁজো ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। ভালোমতো তাকাচ্ছেও না নবনীর দিকে। ভালোমতো তাকালে দেখতে পেত পৃথিবীর সবচে’ রূপবতী তরুণীটি তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

নবনী বলল, ‘আপনি কে?’

‘জ্বি, আমার নাম মবিনউদ্দিন।’

‘এখানে কী করছিলেন?’

‘কিছু করছিলাম না। বসে ছিলাম।’

‘আপনি কী করেন?’

‘আমি মাস্টারি করি।’

‘স্কুল মাস্টার?’

‘জ্বি না, আমি কলেজে শিক্ষকতা করি।’

নবনী কঠিন গলায় বলল, ‘আমাকে বলা হয়েছে এখানে কোনো কলেজ নেই।’

‘কলেজটা পাশের গ্রামে। মাঝে একটা নদী আছে। শিবসা নদী। শিবসা নদীর ঐ পাড়ে কলেজ। মমিনুন্নেসা মেমোরিয়েল কলেজ।’

‘আপনার কলেজ এ গ্রামে, আপনি এখানে এসেছেন কেন?’

নবনী জেরা করার ভঙ্গিতে প্রশ্ন করছে। ধমকের সুরে প্রশ্ন। যেন ভীত মুখে দাঁড়িয়ে থাকা যুবকটি আসামি, সে ফরিয়াদী পক্ষের উকিল। কলেজের এক জন শিক্ষকের সঙ্গে এভাবে কথা বলা যায় না হয়তো। কিন্তু নবনীর খুব রাগ লাগছে। লোকটা কেন তাকে ভয় দেখাল?

‘কথার জবাব দিচ্ছে না কেন? আপনি ঘাপটি মেরে এই গাছের নিচে বসে কী করছিলেন?’

‘কিছু করছিলাম না। চুপচাপ বসে ছিলাম।’

‘ধ্যান করছিলেন নাকি?’
মবিনউদ্দিন জবাব দিল না। কয়েকবার কাশল। এখনো সে মেয়েটির দিকে তাকাচ্ছে না। নবনী বলল, ‘আপনি আমাকে দারুণ ভয় পাইয়ে দিয়েছেন। এত ভয় আমি জীবনে পাই নি। যাই হোক, আপনি আমাকে দয়া করে একটু এগিয়ে দিন। আমার ভয় কাটছে না। আমি ফিশারিজের ডাকবাংলোয় উঠেছি।’
‘জ্বি আমি জানি। আপনি মন্ত্রী সাহেবের বড় মেয়ে।’
নবনীর ভয় কেটে গেল। লোকটি তাকে চিনতে পেরেছে। ভয় কাটার জন্যে এই যথেষ্ট। তাছাড়া কথা বলছে খুব ভদ্র ভঙ্গিতে। কলেজের টিচাররা এত ভদ্র ভঙ্গিতে কথা বলে না। তারা খিটখিটে ধরনের হয়। কে জানে গ্রামের কলেজের টিচাররা হয়তো এরকম। কিংবা এও হতে পারে, লোকটা তাকে চিনতে পেরেছে বলেই এত ভদ্রভাবে কথা বলছে। লোকটার সঙ্গে এতটা খারাপ ব্যবহার করা উচিত হয় নি। পরে সবাইকে বলে বেড়াবে—মন্ত্রীর মেয়ে আমাকে ধমক দিয়েছে। কেউ বুঝবে না, মন্ত্রীর মেয়ে না হলেও নবনী এই পরিস্থিতিতে এভাবেই কথা বলত।
নবনী গলার স্বর স্বাভাবিক করে ফেলে বলল, ‘চলুন যাই। আমাকে এগিয়ে দিতে আপনার অসুবিধা নেই তো?’
‘জ্বি না।’
‘আপনার সঙ্গে আমি রেগে রেগে কথা বলছিলাম। আপনি কিছু মনে করবেন না। আসলে আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম, তারপর ভয়টা কেটে গেল। হঠাৎ ভয় কাটলে মানুষ রেগে যায় এই থিওরিটা কি আপনি জানেন?’
মবিন জবাব দিল না। সে মাথা নিচু করে হাঁটছে। নবনী যাচ্ছে আগে আগে, সে তার পেছনে পেছনে। একটু দূরত্ব নিয়ে হাঁটছে। নবনী পরিস্থিতি সহজ করার জন্যে বলল, ‘আমি যে গাছটার সঙ্গে কথা বলছিলাম, তা কি শুনতে পেয়েছিলেন?’
‘জ্বি।’
‘কী বলছিলাম বলুন তো?’
‘আপনি বলছিলেন, মিস্টার বটগাছ আপনি কোত্থেকে এলেন?’
‘আপনি আমার কথা শুনে অবাক হন নি?’
‘জ্বি না।’
‘অবাক হন নি কেন?’
‘আমি দূর থেকেই দেখেছি আপনি আসছেন। এই জন্যেই অবাক হই নি। আপনাকে না দেখে হঠাৎ যদি কথা শুনতাম তাহলে অবাক হতাম।’
‘আমাকে একা একা আসতে দেখেও অবাক হন নি?’
‘জ্বি না?’
‘কেন অবাক হন নি?’
‘আপনি তো প্রায়ই একা একা হাঁটেন।’
‘আমি একা একা হাঁটি তাও জানেন?’
মবিন অস্বস্তির সঙ্গে বলল, ‘জানি। সবাই জানে। এটা প্রায় গণ্ডগ্রামের মতো জায়গা। শহরের কেউ এলেই সবাই অবাক হয়ে দেখে। আর আপনি হচ্ছেন এক জন মন্ত্রীর মেয়ে। আপনি কী করছেন না করছেন সবাই লক্ষ রাখছে।’
‘তাই নাকি?’
‘জ্বি এটাই তো স্বাভাবিক। এখানে কোনো বড় ঘটনা তো ঘটে না। এক জন মন্ত্রীর মেয়ে একা একা হাঁটছে এটা বিরাট ঘটনা। আপনাকে নিয়ে কলেজের টিচার্স কমনরুমে আলোচনা হয়।’
‘সে কী! কী আলোচনা?’
‘আপনার শোনার মতো কিছু না। আমাদের তো আলোচনা করার কিছু নেই।’
‘কলেজে আপনি কী পড়ান?’

‘ইংরেজি সাহিত্য।’
‘আপনাদের এটা কি ডিগ্রি কলেজ?’
‘জ্বি না। ইন্টারমিডিয়েট কলেজ।’
‘আপনি কি আমার নাম জানেন?’
‘জ্বি জানি। আপনার নাম নবনী।’
নবনী হেসে ফেলল। নিতান্ত অপরিচিত এক জন কলেজের শিক্ষক, যে ভূতের মতো ঘাপটি মেরে বটগাছটির গুঁড়িতে বসেছিল সেও তার নাম জানে, আশ্চর্য হবার মতোই ঘটনা।
‘আপনি কি আমার ছোট বোনের নাম জানেন?’
‘জ্বি না।’
‘আমারটা জানেন তারটা জানেন না কেন? তার নাম হল শ্রাবণী। ত
মবিন কথা বলছে না। একা একা কথা চালিয়ে যাওয়া যায় না। হুঁ হাঁ বলার জন্যেও এক জনকে দরকার। নবনীর কথা বলতে ইচ্ছে করছে। এ রকম তার কখনো হয় না। কথা বলতে ইচ্ছা করে না।
‘মবিন সাহেব!’
‘জ্বি।’
‘আমার ছোট বোনের নামটা আপনার কাছে কেমন লাগল তা তো বললেন না।’
‘সুন্দর নাম।’
‘শ্রাবণ মাসে জন্মেছে বলে শ্রাবণী। ও কী বলে জানেন? ও বলে— ভাগ্যিস আমার ভাদ্র মাসে জন্ম হয় নি। ভাদ্র মাসে জন্ম হলে তার নাম হত ভাদ্রী।’
নবনী হাসছে। আনন্দিত ভঙ্গিতে হাসছে।
তারা বড় রাস্তায় উঠে এল। এখন আর পথ হারানোর ভয় নেই। সোজা পথ। চোখ বন্ধ করেও যাওয়া যাবে। নবনী বলল, ‘মেনি থ্যাংকস। আপনাকে আর আসতে হবে না। এখন আমি যেতে পারব।’
মবিন কিছু বলল না।
নবনী বলল, ‘আপনাকে ডাকবাংলোয় নিয়ে চা খাইয়ে দিতে পারতাম। তা করতে পারছি না। আজ আমাকে বাবার কাছ থেকে বকা খেতে হবে। আপনাকে নিয়ে গেলে আপনিও বকা খাবেন। রেগে গেলে বাবা সবাইকে বকেন। টমিকেও বকেন। টমি হল আমাদের কুকুর। আচ্ছা তাহলে যাই। ভালো কথা, গাছের নিচে বসে কী করছিলেন তা তো বললেন না?’
‘জোছনা দেখার জন্যে বসেছিলাম।’
‘কী বললেন?’
‘জোছনা দেখার জন্যে আমি মাঝে মাঝে গাছের গুঁড়িতে গিয়ে বসি। ওখান থেকে জোছনা সম্পূর্ণ অন্যরকম লাগে।’
‘তাই নাকি?’
‘জ্বি। দেখার মতো দৃশ্য। একবার সারারাত ছিলাম।’
‘সারারাত কি আর জোছনা দেখতে ভালো লাগে?’
‘জ্বি লাগে। জোছনা তো এক রকম থাকে না। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বদলায়। আপনি কি দেখবেন?’
নবনী বিস্মিত হয়ে বলল, ‘কী বললেন?’
মবিন নিচু গলায় বলল, ‘আপনি যদি জোছনা দেখতে চান তাহলে...’
‘তাহলে কী?’
মবিন ইতস্তত করে বলল, ‘গতকাল পূর্ণিমা ছিল। আজ কিছুক্ষণের মধ্যেই চাঁদ উঠবে। গাছের গুঁড়িটা বাঁধানো। সুন্দর বসার জায়গা।’
নবনী তীক্ষ্ণ গলায় বলল, ‘আপনি কি আমাকে নিমন্ত্রণ জানাচ্ছেন আপনার সঙ্গে অন্ধকার গাছের নিচে সারারাত বসে থাকার জন্যে?’

মবিন চুপ করে রইল। নবনী বলল, ‘আপনার সাহস ও স্পর্ধা দেখে অবাক হচ্ছি। এমন অস্বাভাবিক প্রস্তাব আপনি দিলেন কীভাবে? আপনার মাথা ঠিক আছে তো? ‘কমন সেন্স’ বলে একটি ব্যাপার আছে। কমবেশি সবারই তা থাকে। আপনার মনে হয় তাও নেই।’

‘আমি ভেবেছিলাম ...

‘কী ভেবেছিলেন আপনি? আপনার প্রস্তাবে আমি ‘কী আশ্চর্য! কী সুন্দর প্রস্তাব’ বলে লাফিয়ে উঠব তারপর গাছের নিচে সারারাত বসে থাকব? আপনার কি যেন নাম বলেছিলেন?’

‘মবিনউদ্দিন।’

‘শুনুন মবিনউদ্দিন সাহেব। আপনি আমাকে অনেকদূর এগিয়ে দিয়েছেন। আপনাকে ধন্যবাদ। জোছনা দেখার নিমন্ত্রণের জন্যেও ধন্যবাদ। নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারছি না। আমি বয়সে আপনার ছোট। তবু আপনাকে একটা উপদেশ দিচ্ছি এ জাতীয় নিমন্ত্রণ চট করে দেয়া যায় না। আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।’

নবনী হন হন করে এগুচ্ছে। অনেকদূর এসে সে একবার পেছনে ফিরল। মবিনউদ্দিন রাস্তার এক পাশে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

২

নবনী ভেবেছিল ডাকবাংলোয় পৌঁছানোমাত্র সে বকা খাবে। তার বাবা বন ও খনিজ সম্পদমন্ত্রী জামিল চৌধুরী নিশ্চয়ই থমথমে মুখে বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে আছেন। তাঁর সামনে একটা হ্যাজাক লাইট। একটু দূরে সাহেব শুকনো মুখে দাড়িয়ে। ওসি সাহেবের পেছনে মাধবদি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সরুজ মিয়া। সুরুজ মিয়া হাত কচলাচ্ছেন এবং তেলতেলে মুখে হাসছেন। এই মানুষটা ননস্টপ হাসতে পারেন। বকা খেলেও হাসেন। পান খাওয়া লাল দাঁত সর্বক্ষণ বের হয়ে থাকে। তবে তাতে তাঁকে খারাপ লাগে না। মনে হয়, ধবধবে সাদা দাঁতে এই মানুষটাকে মানাত না।

নবনীর খোঁজে নিশ্চয়ই লোকজন বের হয়ে গেছে। ডাকবাংলোর সামনে পুলিশের দুজন সেন্ট্রি থাকে। তারা নবনীর খোঁজে গেছে। ঝোপঝাড়ে পাঁচ ব্যাটারির টর্চের আলো ফেলছে। চারজন আনসারের একটা দল আছে, তারাও নিশ্চয়ই বের হয়েছে। নবনীর মা জাহানারা অস্থির হয়ে পড়েছেন। তাঁর বুক ধড়ফড় করছে। সামান্য উত্তেজনাতেই তাঁর বুক ধড়ফড় করে।

নবনী যা ভেবে রেখেছে তার কিছুই হল না। আজ দিনটা বোধহয় তার জন্যে শুভ। জামিল সাহেব বারান্দায় বসা। তাঁর মুখ গম্ভীর নয়, হাসি হাসি। ওসি সাহেব এ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সুরুজ মিয়ার পান খাওয়া লাল দাঁত দেখা যাচ্ছে।

গেট দিয়ে ঢোকার সময় সেন্ট্রির পুলিশ দুজন একসঙ্গে স্যালুট দিল। নবনীর অস্বস্তি লাগছে। এরা সব সময় তাকে স্যালুট দেয় কেন? সে তো কেউ না। তারচে' বড় কথা স্যালুট দিলে নবনীর কী করণীয়? সে কি হাত তুলে সালাম নেবে? না মাথা ঝুঁকিয়ে হাসবে? বাবাকে জিজ্ঞেস করা দরকার। কখনো মনে থাকে না।

জামিল সাহেব মেয়েকে দেখে উঁচু গলায় বললেন, 'কাণ্ড দেখে যা।

নবনী কাছে এসে কাণ্ড দেখল। জামিল সাহেবের পায়ের কাছে প্রকাণ্ড এক চিতল মাছ ধড়ফড় করছে। নবনী বলল, 'কী সর্বনাশ, এত বড় মাছ হয়!'

সুরুজ মিয়া হাসিমুখে বললেন, 'হয় আম্মা, ক্বচিৎ হয়। এরে বলে রাজ-চিতল। গলাটা লাল। স্যারের ভাগ্যে মাছটা ছিল।'

নবনী বলল, 'আপনি এনেছেন এই মাছ?'

'জ্বি আম্মা। সামান্য জিনিসে স্যার খুশি হবেন ভাবি নাই। স্যার খুশি হয়েছেন। আমার একেবারে চোখে পানি এসে গেছে।'

সুরুজ মিয়ার চোখে আবার পানি এসে গেছে। সত্যি সত্যি পানি। এক জন বয়স্ক লোক যার মাথার বেশিরভাগ চুল পাকা সে এত সহজে কেঁদে ফেলতে পারে? নবনী ভেবে পাচ্ছে না, এই লোকটা আসলেই কাঁদছে, না যে কোনো পরিস্থিতিতে চোখে পানি আনার দুর্লভ ক্ষমতা আয়ত্ত করেছে?

জামিল সাহেব দরাজ গলায় বললেন, 'খুশি হবারই কথা। এত বড় মাছ আজকাল তো চোখে পড়ে না। মাছটার ওজন কত হবে মনে হয়?'

'ওজন করাই নাই স্যার। ওজন করায়ে নিয়ে আসি।'

'না, থাক থাক, দরকার নেই।'

'অবশ্যই দরকার আছে স্যার। আপনার মুখের কথা হুকুমের বাবা। ওসি সাহেব, মাছটা ধরেন তো। একলা পারব না। ত

দুজন মাছের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। শূন্যে ঝুলিয়ে যে দ্রুততার সঙ্গে বের হয়ে গেল তাতে মনে হয় আগামী কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ওজন না নিলে একটা বিপর্যয় ঘটে যাবে। জামিল সাহেব মেয়ের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। হাসতে হাসতে বললেন, 'তোর জন্যে একটা সারপ্রাইজ আছে।'

'কী সারপ্রাইজ?'

'বোস আমার পাশে। এখন অনুমান কর।

'আমার M. Sc. রেজাল্ট হয়েছে?'
'উঁহু। শাহেদ এসেছে।'
'কী বললে?'
'হ্যাঁ শাহেদ। আমি চেয়ারম্যান সুরুজ মিয়ার সঙ্গে গল্প করছিলাম, হঠাৎ দেখি সুটকেস হাতে হেলতে দুলতে কে যেন আসছে। চেহারা দেখছি, তারপরেও বিশ্বাস হচ্ছে না। যা ভেতরে যা।'
নবনী ভেতরে গেল না। বসে রইল। বাবার সামনে থেকে উঠে যেতে এখন লজ্জা লাগছে।
জামিল সাহেব বললেন, 'কি, এখন খুশি তো? যা ভেতরে যা।'
নবনী নিচু গলায় বলল, 'যাব। তাড়া তো কিছু নেই।'
জামিল সাহেব সিগারেটের প্যাকেট বের করতে করতে আনন্দিত গলায় বললেন, 'ছোট ব্যাপার নিয়ে তোরা যে ঝগড়া মাঝেমধ্যে করিস, আমি রীতিমতো আতংকগ্রস্ত হই। তোদের বিয়ের ঝামেলা আমি এবার চুকিয়ে ফেলব। আর দেরি করা যাবে না।'
'বাবা, তোমাকে তো বলেছি রেজাল্ট না হলে বিয়ে করব না।'
'আচ্ছা সেটা দেখা যাবে। রেজাল্টের খুব বেশি দেরি আছে বলে তো মনে হয় না। এই সপ্তাহেই বের হবার কথা না? মা, আমাকে কফি দিতে বল তো।
নবনী উঠে গেল। ঘরের ভেতর ঢুকতে তার লজ্জা লাগছে। চট করে শাহেদের সামনে সে পড়তে চাচ্ছে না। নিজেকে একটু গুছিয়ে নিতে হবে। চুল এলোমেলো হয়ে আছে। পা ভর্তি ধুলো। নবনী ধরেই নিয়েছিল শাহেদের সঙ্গে তার দেখা হবে না। দেখা হলেও সৌজন্য কথাবার্তার মতো হবে। "কেমন আছ?" "ভালো" জাতীয় অর্থহীন আলাপ।

.

জাহানারা রান্নাঘরে। সমুচা ভাজছেন। পনীরের সমুচা। ভাগ্যিস, ঢাকা থেকে পনীর নিয়ে এসেছিলেন। পনীরের সমুচা শাহেদের খুব পছন্দ। সে মিষ্টি খেতে পারে না। ডাকবাংলো ভর্তি হয়ে গেছে মিষ্টিতে। এত মিষ্টি কী করবেন তিনি জানেন না। ডাকবাংলোয় ফ্রিজ নেই। ইলেকট্রিসিটি যখন আছে একটা ফ্রিজ থাকতে পারত। তিনি ঠাণ্ডা পানি ছাড়া খেতে পারেন না। শীতকালেও তাঁর বরফের কুচি মেশানো ঠাণ্ডা পানি চাই।
নবনী রান্নাঘরে ঢুকে বলল, 'মা, বাবা কফি চাচ্ছে।'
জাহানারা মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'শাহেদের সঙ্গে দেখা হয়েছে?'
'এখনো হয় নি।
'তুই এতক্ষণ ছিলি কোথায়?'
'একটু ঘুরতে গিয়েছিলাম।
'শাহেদ যে এসেছে শুনেছিস?'
'হ্যাঁ।'
'আমি কিন্তু তোর বাবাকে বলেছিলাম—শাহেদ চলে আসবে। আজ সকালেও কেন জানি মনে হয়েছে।
'তোমার অসাধারণ ইএসপি ক্ষমতার জন্যে অভিনন্দন। এখন বাবাকে কফি করে দাও।'
'কফি দেয়া যাবে না। সবাইকে এক সঙ্গে চা-নাশতা দেব। তুই যা, শাহেদের সঙ্গে কথা বলে আয়।'
'তোমার কোনো সাহায্য লাগবে না?'
'না, সাহায্য লাগবে না। আমি কবে তোর সাহায্য নিয়েছি? তুই রান্নাঘর থেকে যা তো।'
রান্নাবান্নার ব্যাপারে জাহানারা কারোর সাহায্যই নেন না। ডাকবাংলোয় এক জন বাবুর্চি আছে। তিনি নিজেও তাদের অনেকদিনের পুরোনো বুয়া মিলুকে সঙ্গে এনেছেন। এরা কেউ কিছু করছে না। শুকনো মুখে দূরে দূরে ঘুরছে। এদের কারোরই খাবার কোনো জিনিসে হাত দেয়ার হুকুম নেই। জাহানারার খারাপ ধরনের শুচিবায়ু আছে। নিজে তা স্বীকার করেন না। কেউ এই প্রসঙ্গে কিছু বললেও রেগে যান।
বাবুর্চিকে দিয়ে খাবার জিনিসে হাত না দেওয়ানোর পেছনে তাঁর বক্তব্য হচ্ছে 'হাত দিয়ে তারা

কখন কী করে তার ঠিক আছে? কিছুক্ষণ আগেই হয়তো নাক ঝেড়ে এসেছে। বেশিরভাগ মানুষই নাক ঝাড়ার পর হাত ধোয় না। মুছে ফেলে। আর যদি-বা ধোয়, কজন সাবান ব্যবহার করে? এরা অন্য জিনিসে হাত দিচ্ছে, দিক। কিন্তু খাবার জিনিসে হাত দেবে, সেই খাবার আমি খাব—তা হবে না।
মিলু বলল, 'আপনের গরম লাগতেছে, সমুচা আমি ভাজি?' জাহানারা বললেন, 'না। তুই দূরে থাক। এই ঘর থেকে চলে যা।' মিলু একটু সরে গেল কিন্তু ঘর থেকে বের হল না।

.
মিলু প্রায় কুড়ি বছর ধরে তাদের সঙ্গে আছে। দশ বছর বয়সে ভিক্ষা করতে এসেছিল। জাহানারা তার সুন্দর মুখ দেখে অবাক হয়ে বললেন, 'ভিক্ষা করছিস কেন, বাসায় কাজ করবি? মিলু বলল, 'না।' তিনি মেয়েটাকে একটা জামা দিলেন। পাঁচটা টাকা দিলেন। বলে দিলেন, 'যদি কাজ করতে ইচ্ছে হয় চলে আসিস।' মেয়েটা পরের দিনই চলে এল। তিনি বললেন, 'কি রে থাকবি?'
'হুঁ।'
'নাম কি তোর?'
'কুদরতী।'
'হুঁ না বল জ্বি। 'জ্বি।'
'পা ছুঁয়ে সালাম কর।'
মিলু পা ছুঁয়ে সালাম করল।
'জাহানারা বললেন, 'তোর চেহারা ছবি সুন্দর। তুই ভালোমতো থাক তোর ভালো হবে। বয়সকালে বিয়ে দিয়ে দেব। তোর বয়েসী মেয়ে পথেঘাটে ঘোরাও ঠিক না। থাকবি তো ঠিকমতো?'
'হুঁ।'
'হুঁ না-বল জ্বি।'
'জ্বি।'
'ভালোমতো থাকবি। আদব কায়দা শিখবি। কাজকর্ম শিখবি। সময় কালে আমি টাকা-পয়সা খরচ করে বিয়ে দেব।'
'জ্বি আচ্ছা।'
জাহানারা তাঁর কথা রেখেছেন। মিলুর বিয়ে দিয়েছেন তাঁদের ড্রাইভার রহমতের সঙ্গে। বিয়ের পরেও মিলু ঘরেই আছে। ছেলেপুলে হয় নি। একদিক দিয়ে সুবিধাই হয়েছে। ছেলেপুলে হয়ে গেলে নিজের কাছে রাখতে পারবেন না। যেখানে যান নিজের সঙ্গে রাখেন।

.
শাহেদকে কোথাও পাওয়া গেল না। ডাকবাংলোর সর্ব পশ্চিমের ঘরটা নবনীর ছোট বোন শ্রাবণীর। আর তিন মাস পরেই তার আইএসসি ফাইনাল পরীক্ষা। ছুটি কাটাতে এসেও সে নিরিবিলি পড়বে এই অজুহাতে ডাকবাংলোয় সবচে' সুন্দর ঘরটা নিয়ে নিয়েছে। এই ঘরটা নাকি নিরিবিলি। তার ঘরের সঙ্গের বারান্দাটা নদীর দিকে। বারান্দায় দাঁড়ালেই নদী দেখা যায়। শীতকাল বলেই নদী শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। নদীর চেয়েও যা চোখে পড়ে তা হল নদীর চর। চাঁদের আলোয় বালির চর চিকচিক করে। অদ্ভুত লাগে দেখতে। শ্রাবণী এখানে আসার আগে দু সুটকেস ভর্তি বই নিয়ে এসেছে। এক সুটকেসে পাঠ্যবই। এক সুটকেসে গল্পবই। পাঠ্যবইয়ের সুটকেসের তালা খোলা হয় নি। গল্পের বইয়ের সুটকেস খোলা হয়েছে। সে ক্রমাগত গল্পের বই পড়ে যাচ্ছে। প্রতিটি বই তার আগেই পড়া। একবার না, কয়েকবার করে পড়া। তারপরেও এমন ভাবে পড়ছে যেন নতুন বই।
বই
নবনী ঘরে ঢুকে দেখল, শ্রাবণী খাটে পা ঝুলিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে বসে আছে। তার হাতে বই। গলায় লালরঙা মাফলার। শ্রাবণীর গলায় লালরঙা মাফলারের মানে হল টনসিলের সমস্যা

হয়েছে। কিছুদিন পর পর তার টনসিলের সমস্যা হয়। ঢোক গিলতে পারে না। সে কাউকেই কিছু বলে না। একটা লাল মাফলার গলায় পেঁচিয়ে খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে দেয়—।
নবনী বলল, 'তোর কি গলাব্যথা?'
শ্রাবণী বই থেকে মাথা না তুলে বলল, 'হুঁ।'
'জ্বর আসে নি তো, গাল লাল লাগছে।'
'এসেছে। একশ এক পয়েন্ট ফাইভ।'
'কী পড়ছিস?'
'নির্বাচিত ভূতের গল্প। এখন পড়ছি পরশুরামের মহেশের মহা যাত্রা।'
'আজ কি সারাদিনই বই পড়লি?'
'হুঁ। মাঝখানে একবার বাবা মাছ দেখতে ডাকলেন। মাছ দেখলাম। বাবাকে খুশি করার জন্যে বিকট চিৎকার দিলাম—'ও মাগো! এটা কী? মাছ নাকি? ওয়াক থু। মাছ এত বড় হয়?'
বই
নবনী হেসে ফেলল। শ্রাবণী হাসল না। পা নাচাতে লাগল। নবনী বলল, 'যত দিন যাচ্ছে ততই একটা ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার হয়ে দাঁড়াচ্ছিস। ব্যাপারটা কেউ লক্ষ করছে না।'
শ্রাবণী হাই তুলতে তুলতে বলল, 'কেউ যে করছে না তা না, কেউ কেউ করছে। আচ্ছা আপা, এখন তুমি যাও। ভূতের গল্প একনাগাড়ে পড়তে হয়। মাঝখানে ইন্টারাপশান হলে পড়াই মাটি। মনে হচ্ছে তুমি শাহেদ ভাইকে খুঁজছ। খুঁজে না পেয়ে বিব্রত বোধ করছ। কাউকে মুখ ফুটে জিজ্ঞেসও করতে পারছ না। উনি গোসল করার জন্যে কুয়াতলায় গেছেন। ডাকবাংলোয় একটা কুয়া আছে, তুমি জান কিনা জানি না। কুয়ার পানি অসম্ভব পরিষ্কার। শাহেদ ভাই সেই পরিষ্কার পানিতে গা ধুবেন।'
'এই ঠাণ্ডায় কুয়ার পানি?'
'হ্যাঁ। উনার যেহেতু টনসিলের সমস্যা নেই, ঠাণ্ডা পানিতে কিছু হবে না।'
'কুয়ার পানিতে গোসলের বুদ্ধি কি তুই দিয়েছিস?'
শ্রাবণী পা নাচাতে নাচাতে বলল, 'হুঁ। গতকাল কুয়ার পানিতে আমি গোসল করে ঠাণ্ডা লাগিয়েছি। আজ লাগাবেন শাহেদ ভাই। আপা, এখন কি তুমি যাবে? গল্পটা শেষ করতে চাই। তুমি এক কাজ কর, কুয়ার পাড়ে চলে যাও। আমার বারান্দা দিয়ে নামার সিঁড়ি আছে। এস, তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।'
'দেখাতে হবে না।
নবনী কী করবে ঠিক ভেবে পেল না। শেষ পর্যন্ত কুয়াতলার দিকে রওনা হল। ডাকবাংলোর জায়গাটা অনেক বড়। কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা। পেছনে রীতিমতো আম কাঁঠালের বাগান। নবনীরা দুদিন পার করে দিয়েছে, এখনো ডাকবাংলোর চারপাশ ভালো করে দেখা হয় নি। সে জানতই না—এদের কুয়াতলাও আছে। ডাকবাংলোয় সাধারণত কুয়া থাকে না।
শাহেদ গোসল শেষ করে হি-হি করে কাঁপছে। তার গায়ে মোটা টাওয়েল। শাহেদ একা নয়। ডাকবাংলোর কেয়ারটেকার দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে হারিকেন। মালীও আছে। সে এতক্ষণ পানি তুলে দিচ্ছিল।
নবনী কুয়াতলার পাশে এসে দাঁড়াল। সহজ গলায় বলল, 'কেমন আছ?'
শাহেদ বলল, 'খুব খারাপ আছি। শ্রাবণীর কথা শুনে পুরোপুরি বিভ্রান্ত হয়েছি। সে বলেছে কুয়ার পানি গরম। আমি সরল মনে বিশ্বাস করেছি।'
'বললেই তো ওরা পানি গরম করে দিত।'
'তা তো দিতই।'
'তোমার আসতে অসুবিধা হয় নি?'
'হয়েছে। অনেক ঝামেলা করে আসতে হল।
'এলে কেন ঝামেলা করে?'
শাহেদ হাসল। নবনী চোখ ফিরিয়ে নিতে গিয়েও নিতে পারল না। মনে মনে ভাবল, 'এত

সুন্দর করে মানুষ হাসে কীভাবে?'
'আমি হঠাৎ উপস্থিত হওয়ায় খুশি হয়েছ তো?'
নবনী জবাব দিল না। সে প্রচণ্ড খুশি হয়ে গেছে। তার এত আনন্দ হচ্ছে। ভাগ্যিস কেউ তা বুঝতে পারছে না। নবনী চায় না কেউ বুঝে ফেলুক।
'আমি আসব—এটা নিশ্চয়ই আশা করনি?'
'না।'
'খুশি হয়েছ কিনা তা তো বললে না।'
নবনী হালকা গলায় বলল, 'প্রচণ্ড রাগ করেছি। রাগে অন্ধ হয়ে গেছি। কেন এলে?' বলেই হেসে ফেলল।
তারা ডাকবাংলোর দিকে এগুচ্ছে। নবনী কেয়ারটেকারের হাত থেকে হারিকেন নিয়ে নিয়েছে। সে যাচ্ছে আগে আগে, শাহেদ পেছনে পেছনে আসছে।
'নবনী।'
'উঁ।'
'আমি যে হঠাৎ এখানে এসে তোমাকে চমকে দেব তা আগে থেকে ঠিক করা। সব প্রি-প্ল্যানড। প্রচণ্ড রকম ঝগড়া তোমার সঙ্গে হল, সেই ঝগড়াও কিন্তু প্ল্যানের একটা অংশ। যাতে তুমি ধারণা কর আমি আসব না। অবশ্যি পুরো ব্যাপারটা আমি যেভাবে চেয়েছিলাম সেভাবে হয় নি।'
'তুমি কীভাবে চেয়েছিলে?'
'আমি ঠিক করে রেখেছিলাম গভীর রাতে উপস্থিত হব। তুমি তখন ঘুমিয়ে পড়েছ। আমি তোমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে খুব ক্যাজুয়েল ভঙ্গিতে বলব, এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি দাও তো নবনী। হা-হা-হা।'
নবনী বলল, 'আমি তোমার সঙ্গে অকারণে ঝগড়া করেছি। তুমি কিছু মনে কোরো না। আমি লজ্জিত, খুব লজ্জিত। আমি ক্ষমা প্রার্থনা করে তোমার কাছে দীর্ঘ চিঠি লিখছি।'
'আমি কিন্তু কোনো চিঠি পাই নি।'
'তুমি পাও নি। কারণ আমি চিঠি পাঠাই নি। চিঠি এখানেই আছে।'
'পড়তে পারব?'
'দেখতে পারবে। কিন্তু পড়তে পারবে না।'
'পড়তেই যদি না পারি তবে দেখে কী লাভ?'
'আমি আঠার পাতার একটা চিঠি লিখেছি। এটা জানবে। চিঠি না দেখলে কী করে বুঝবে।'
'সত্যি আঠার পাতার চিঠি?'
'হুঁ।'
'বল কী। আমি তো শুদ্ধ বাংলায় আঠারটা লাইন লিখতে পারি না। বাংলায় চিঠিপত্র লিখতে গিয়ে যা সমস্যা হচ্ছে। এক জন সেক্রেটারি রেখেছি। সে নাকি বাংলায় অনার্স করেছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে সে আমার চেয়েও কম বাংলা জানে। সেদিন আমাকে এসে জিজ্ঞেস করল—স্যার Acceptance এর সুন্দর বাংলা কী হবে?'
'তুমি কী বললে?'
'আমি কিছুই বললাম না। ওর দিকে রাগী রাগী চোখে তাকিয়ে রইলাম। Acceptance এর সুন্দর বাংলা যদি আমি জানতাম তাহলে ওকে পাঁচ হাজার টাকা মাইনে দিয়ে রাখতাম?'
'সেটাও একটা কথা।'

.

জাহানারা নাশতার অনেক আয়োজন করেছেন। পনীরের সমুচা ছাড়াও লুচি ভেজেছেন। মুরগির কোরমা করেছেন। আলুর চপ তৈরি হয়েছে। ডাকবাংলোর খাবার ঘরে খাবার দেয়া হয়েছে। সবাই গোল হয়ে বসেছে। টেবিলটা বেশি বড়। মনে হচ্ছে কনফারেন্স রুম। তারা যেন খেতে বসে নি, জরুরি আলোচনায় বসেছে। শ্রাবণীর গলায় মাফলার নেই। মনে হয়

গলাব্যথা কমেছে। এখন ইলেকট্রিসিটি নেই। হ্যাজাক জ্বলছে।
জাহানারা স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, তোমাদের ইলেকট্রিসিটি এত ঘন ঘন যায় কেন?'
'আমাদের বলছ কেন? বিদ্যুৎ তো আমার দপ্তর না। আমার হল বন এবং খনিজ সম্পদ। বনের ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন থাকলে বল।'
শ্রাবণী বলল, 'আমার একটা প্রশ্ন আছে।'
'কী প্রশ্ন মা?'
'বাংলাদেশের বনে মোট কতগুলো ময়ূর আছে বাবা?'
'কতগুলো ময়ূর আছে তা তো বলতে পারব না। তবে রয়েল বেঙ্গল টাইগার কতগুলো আছে তা বলা যাবে। গত বৎসর সেনসাস হয়েছে।'
'রয়েল বেঙ্গল টাইগার কতগুলো আছে?'
'অফ হ্যান্ড বলতে পারব না মা। সেক্রেটারিকে জিজ্ঞেস করে জানতে হবে।'
'উনাকে কী করে জিজ্ঞেস করবে। এখানে তো টেলিফোন নেই।'
'ওয়্যারলেসে ম্যাসেজ পাঠিয়ে দেব। সব থানায় ওয়্যারলেস আছে।'
শাহেদ বলল, 'রয়েল বেঙ্গল টাইগারের সংখ্যা জানা কি খুব দরকার শ্রাবণী?'
শ্রাবণী বলল, 'হ্যাঁ দরকার। রয়েল বেঙ্গল টাইগারের সঠিক সংখ্যা না জানলে আমি আজ রাতে ঘুমাতে পারব না।' জামিল সাহেব হো-হো করে হেসে উঠলেন।

.

সুরুজ মিয়া মাছ নিয়ে ফিরে এসেছেন। চর ওজন হয়েছে একচল্লিশ কেজি। জামিল সাহেব বললেন, 'বাহ্ বাহ্, এক মনের বেশি। খুবই আশ্চর্য ব্যাপার।'
সুরুজ মিয়া বললেন, 'পাল্লা-পাথর নিয়ে এসেছি। আপনার সামনে একবার মাপব।'
'কোনো দরকার নেই।'
'স্যার, শখ করে এনেছি। আপনার সামনে একটু মাপি।'
মাপা হল। একচল্লিশ কেজি দুশ গ্রাম। শ্রাবণী বলল, 'আপনি তো বললেন, একচল্লিশ কেজি। দুশ গ্রাম বেশি হল কেন?'
'যখন প্রথম ওজন নিয়েছিলাম, মাছটা জিন্দা ছিল। এখন মাছটা মারা গেছে। মৃত্যুর পর ওজন বেড়ে যায় মা।'
'কেন?'
'মৃত্যুর পর মাটির টানে বাড়ে।'
জামিল সাহেব বললেন, 'সুরুজ মিয়া আপনি অনেক ঝামেলা করেছেন। এখন বাসায় গিয়ে বিশ্রাম করুন। মেনি থ্যাংকস।'
'মাছটা কাটায়ে তারপর যাব স্যার। এত বড় মাছ সবাই কাটতে পারে না। পেটি নষ্ট হয়ে যাবে। মাছ কাটার লোক এবং বঁটি নিয়ে এসেছি।'
'ভালো করেছেন।'
জামিল সাহেব ইতস্তত করে বললেন, 'মাছ যে কাটবে সে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তো? আমার স্ত্রী আবার এইসব ব্যাপারে খানিকটা কি যেন বলে শুচিবায়ুর মতো আছে।'
সুরুজ মিয়া হাসিমুখে বললেন, 'আপনি এটা নিয়ে চিন্তা করবেন না, স্যার। আমি তারে সাবান দিয়ে গোসল করায়ে তারপর মাছের কাছে নিয়ে যাব। ময়লা হাতে মাছ ছোঁয়াও ঠিক না। আমি এখনি তারে গোসলে পাঠায়ে দেই।'
শ্রাবণী বলল, 'চেয়ারম্যান চাচা, আপনার সঙ্গে আমার খুব জরুরি একটা কথা আছে। অসম্ভব জরুরি!'
'কী কথা মা?'
'সবার সামনে বলা যাবে না। আপনি আমার সঙ্গে বারান্দার ঐ মাথায় আসুন।'
সুরুজ মিয়া বিস্মিত এবং আনন্দিত মুখে এগুলেন। বিস্মিত ও আনন্দিত হবার মূল কারণ হচ্ছে

— মন্ত্রী সাহেবের মেয়ে তাকে চাচা ডাকছে। আফসোসের ব্যাপার হল, ডাকটা বাইরে কেউ শুনতে পায় নি। ওসি সাহেব সামনে নেই। সে শুনলেও কাজ হত। আর দশ জনের কাছে বলত।'

সুরুজ মিয়া বললেন, 'কী কথা আম্মা?'

'আপনি কি আমার জন্যে একটা জিনিস জোগাড় করে দিতে পারবেন?'

'অবশ্যই পারব। এখানে না পাওয়া যায়, ঢাকা থেকে নিয়ে আসব। রাত একটায় একটা ট্রেন আছে। ঐ ট্রেনে লোক পাঠায়ে দিব।'

'ঢাকা থেকে আনতে হবে না। আমার মনে হয় এখানেই পাওয়া যাবে। হয়তো আপনার বাড়িতেই আছে।'

'জিনিসটা কী?'

'একটা মই।'

'মই! মই কী জন্যে?'

'এই ডাকবাংলোর ছাদে উঠার ব্যবস্থা নেই। আমি মই দিয়ে ছাদে উঠব।'

'আমি এখনি মই নিয়া আসতেছি।'

'এখনি আনার দরকার নেই। এখন আনলে বাবা দেখে ফেলবেন, রেগে যাবেন। আপনি বরং কাল সকালে নিয়ে আসবেন। নটার আগে। নটা পর্যন্ত বাবা ঘুমিয়ে থাকেন। তিনি কিচ্ছু জানতে পারবেন না।'

সুরুজ মিয়া ভীত গলায় বললেন, 'স্যার যদি রাগ করেন তাহলে কাজটা করা কি ঠিক হবে আম্মা?'

'কোনো অসুবিধা নেই। আপনি তো আর জানেন না কি জন্যে আমি মই চেয়েছি। আমি আপনার কাছে চেয়েছি। আপনি সরল মনে এনে দিয়েছেন।'

৩

নবনীর ঘরটা ছেড়ে দেয়া হয়েছে শাহেদের জন্যে। ডাকবাংলোয় আরেকটা সুন্দর কামরা ছিল, অনেক বড়, এটাচড্ বাথ। কিন্তু সেই কামরায় জানালার একটা কাচ ভাঙা। ভাঙা জানালায় শীতের হাওয়া ঢুকছে। শাহেদকে এখানে থাকতে দেয়া যায় না। তা ছাড়া তার জ্বর আসছে বলে মনে হচ্ছে। অবেলায় কুয়ার পানিতে গোসলের ফল ফলতে শুরু করেছে। গা ম্যাজম্যাজ করছে। রাতে সে চিতল মাছের একহাত সাইজ পেটি খেতে পারে নি খানিকটা মুখে দিয়েই বলেছে, 'খেতে খুব ভালো হয়েছে কিন্তু আমি খেতে পারছি না।' থার্মোমিটারে এখনো জ্বর পাওয়া যাচ্ছে না। জামিল সাহেব বললেন, 'ডাক্তার খবর দেব?'

শাহেদ বলল, 'এখানে ডাক্তার আছে?'

'এখানে নেই। মাধবনগরে এক জন এমবিবিএস আছেন। লোক পাঠিয়ে নিয়ে আসি? বেশিক্ষণ লাগবে না। যাবে আর আসবে। পাঠাব?'

'লাগবে না। ভালো ঘুম হলেই শরীর ঠিক হয়ে যাবে।'

'তাহলে রাত করার কোনো দরকার নেই। তুমি শুয়ে পড়।'

শাহেদ ঘুমাতে গেল। জাহানারা বার বার বলে দিলেন, 'কোনো অসুবিধা হলেই আমাদের ডেকে তুলবে। তাছাড়া আমাকে ডেকে তুলতেও হবে না। আমি বলতে গেলে সারারাত জেগেই থাকি। আমার ঘুম হয় না।'

'ঘুম হয় না কেন?'

'নতুন জায়গায় আমার ঘুম হয় না। ঘুমের ওষুধ খেলেও হয় না। দশ-পনের দিন এখানে থাকলে জায়গাটা পুরোনো হবে, তারপর ঘুম হবে। এই জন্যে বাড়ি ছেড়ে কোথাও যেতে চাই না। তোমার চাচা জোর করে নিয়ে এসেছেন। আগে একবার এসেছিলেন—তখন নাকি জায়গাটা খুব মনে ধরেছিল—খুব সুন্দর, হেনতেন, কত কথা।

'জায়গা তো সুন্দরই।'

'সুন্দরের কী আছে? বাংলাদেশের সব জায়গাই তো এরকম। নদী, গাছপালা, মাঠ, আলাদা কিছু তো না। তাও যদি ডাকবাংলোটা সুন্দর হত। পাকা দালান করে রেখেছে। বাংলো হবে কাঠের। তার উপর দেখ—ইলেকট্রিসিটি আছে, কিন্তু অন্য কোনো সুযোগ- সুবিধা নেই। একটা ফ্রিজ নেই, ওয়াটার হিটার নেই। ইলেকট্রিসিটির যে অবস্থা! এই আছে, এই নেই। সারাক্ষণ হ্যাজাক জ্বালিয়ে রাখতে হয়। হিসহিস শব্দ আসে—আমার মনে হয় ঘরে সাপ ঢুকেছে। শাহেদ, শুতে যাবার আগে তোমার চা বা কফি খাবার অভ্যাস আছে?'

'অভ্যাস নেই। কিন্তু আজ এক কাপ গরম চা খাব।'

'তুমি তোমার ঘরে চলে যাও। আমি চা বানাচ্ছি।'

'আপনাকে বানাতে হবে না, চাচি। কাউকে বলুন, বানিয়ে দেবে।'

'কাউকে বলতে হবে না। চা আমিই বানাব। আমি নিজেও খাব। নিজের চা নিজে না বানালে আমি খেতে পারি না।'

.

চা নিয়ে এল নবনী। ট্রেতে করে এক কাপ চা, এক গ্লাস পানি। শাহেদ চা খাবার পর পর এক গ্লাস পানি খায়।

শাহেদ চাদর মুড়ি দিয়ে বিছানায় বসে আছে। তার হাতে গত সপ্তাহের টাইম। এ সপ্তাহের টাইম বের হয়ে গেছে। আগের সপ্তাহেরটা পড়া হয় নি। কোথায় যেন পড়েছিল—ছুটি কাটাতে এসে আপটুডেট কিছু পড়তে নেই। পুরোনো জিনিস পড়তে হয়। খবরের কাগজও পড়া যাবে না। পড়লেও মাসখানিক আগের বাসি কাগজ পড়তে হবে।

নবনী বলল, 'জ্বর কি এসে গেছে?'

'আমার মনে হচ্ছে এসেছে, থার্মোমিটার বলছে না। তোমাদের থার্মোমিটার নষ্ট না তো?'

নবনী শাহেদের কপালে হাত রেখে হাসিমুখে বলল, 'থার্মোমিটার নষ্ট, তোমার গা গরম। প্যারাসিটামল খাবে? প্যারাসিটামল আছে।'

'না। তুমি বস তো খানিকক্ষণ।'
নবনী বসল। শাহেদ বলল, 'আমি এসেই তোমাকে ঘরছাড়া করছি—তুমি ঘুমাচ্ছ কোথায়?'
'শ্রাবণীর সঙ্গে।'
'কাল জানালার কাচটা লাগিয়ে ফেললে—আমি ঐ ঘরে চলে যেতে পারব। তুমি ফিরে আসবে তোমার জায়গায়।'
'কেন, আমার ঘরে থাকতে কি তোমার ভালো লাগছে না?'
'লাগছে। তবে আরো ভালো লাগত যদি তুমিও থাকতে।'
নবনী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। শাহেদ এত সহজ ভাবে এমন সব কথা বলে যে দারুণ অস্বস্তি লাগে। যদিও অস্বস্তি লাগার হয়তো কিছু নেই। এ ধরনের কথা বলার অধিকার শাহেদের আছে।
'নবনী!'
'কি?'
'গম্ভীর হয়ে আছে কেন? একটু আগে যা বললাম তা শুনে মেজাজ খারাপ হয়ে গেল নাকি?'
'না।'
'মনে হচ্ছে মেজাজ কিছুটা খারাপ হয়েছে। আমি তোমার সঙ্গে খুব ভয়ে ভয়ে চলি। এমন সুপার সেনসেটিভ মেয়ে। তোমার উচিত ছিল ভিক্টোরিয়ান যুগে জন্মানো। তুমি ভুল সময়ে জন্মেছ।'
'চা ঠাণ্ডা হচ্ছে—চা খাও।'
'খাচ্ছি। চা খেতে খেতে কঠিন সুরে তোমাকে কিছু কথা বলব। রাগ কর আর যাই কর।'
'রাগ করব না। বল কী বলবে।'
'সত্যি রাগ করবে না?'
'না।'
'তোমার মধ্যে একধরনের অদ্ভুত শুচিবায়ু আছে। এই শুচিবায়ু থাকাটা কি উচিত?'
'আমার এমন কিছু নেই।
শাহেদ হাসতে হাসতে বলল, 'আছে। খুব ভালোভাবেই আছে। তুমি নিজেও তা জান। এই কারণে তুমি নিজেও নিজের কাছে ছোট হয়ে থাক। সংকুচিত হয়ে থাক। গত বার আমার সঙ্গে যে ঝগড়াটা করলে—কেন করলে?'
'আমি তো বলেছি আমি লজ্জিত, দুঃখিত।'
'যত লজ্জিত বা যত দুঃখিতই হও এরকম পরিস্থিতি হলে তুমি আবারো ঝগড়া করবে, কান্নাকাটি করবে। অথচ কত সামান্য ব্যাপার।'
'আমি স্বীকার করছি সামান্য ব্যাপার।'
'তুমি মুখে বলছ স্বীকার করছি সামান্য ব্যাপার। আসলে স্বীকার করছ না। আমি কী করেছি—রিডার্স ডাইজেস্টের একটা মজার রসিকতা তোমাকে বলেছি।'
নবনী কঠিন স্বরে বলল, 'রসিকতাটা মোটেই মজার নয়।'
'এটা তোমার অভিমত, কিন্তু রিডার্স ডাইজেস্ট মনে করে রসিকতাটা মজার। যে কারণে তারা এটা ছেপেছে—রসিকতাটা হল...।'
'একবার তো বলেছ। আবার কেন?'
'আবারো শোন এবং আমাকে বল এটা শুনে হৈচৈ করার এবং কান্নাকাটি করার মানেটা কি। আমি গল্পের প্রতিটি স্টেপ ভেঙে ভেঙে বলব—এক জন রূপবতী তরুণী মেয়ে পার্টিতে গিয়েছে। সেখানে তার হঠাৎ বাথরুম পেল। সে...'
নবনী কঠিন মুখে বলল, 'প্লিজ স্টপ ইট।'
শাহেদ চুপ করে গেল। নিঃশব্দে চা শেষ করল। খানিকক্ষণ দুজনই চুপচাপ বসে থাকার পর আবার স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথাবার্তা শুরু হল। শাহেদ বলল, 'তোমাদের ছুটি কেমন কাটছে?'
'খুব ভালো কাটছে। একেক জন একেক জনের মতো ছুটি কাটাচ্ছে। শ্রাবণী এই দুদিন তার

নিজের ঘর থেকে বের হয় নি। গল্পের বই পড়ে যাচ্ছে। মা এই দুদিন রান্নাঘরে কাটিয়েছেন। বাবা বারান্দায় বসে বিভিন্ন লোকজনের সঙ্গে আলাপ করছেন।'
বই
'আর তুমি? তুমি কী করছ?'
'আমি একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছি। একেক দিন, একেক জায়গায় যাচ্ছি।'
'আজ কোথায় গিয়েছিলে?'
'আজ একটা প্রাচীন বটগাছ দেখে এসেছি। তোমাকে নিয়ে একদিন যাব। ইন্টারেস্টিং বটগাছ।'
'ইন্টারেস্টিং কোন অর্থে?'
'বিশাল অর্থে। তাছাড়া বটগাছের গুঁড়ি বাঁধানো। ঝুরি নেমে অদ্ভুত দেখাচ্ছে।'
'বটগাছ ছাড়া আর কী দেখলে?'
'টিয়া পাখি দেখলাম। ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়া পাখি।'
'টিয়া পাখিগুলোকেও কি ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে?'
'না। ওদের দেখে একটু ভয় ভয় লেগেছে।'
'ভয়ের কী আছে?'
'একসঙ্গে এত পাখি। তাছাড়া এরা খুব নিচু হয়ে উড়ছিল।'
শাহেদ শার্টের পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল। নবনী বিস্মিত হয়ে বলল, 'তুমি সিগারেট ধরেছ নাকি?'
'কয়েক দিন হল সিগারেট টানছি। মনে হচ্ছে নেশা ধরে গেছে।'
'দিনে কটা খাও?'
'দিনে বেশি খাই না। রাতে খাই।'
'তুমি কি কোনো কিছু নিয়ে চিন্তিত?'
'হুঁ।'
'কী নিয়ে চিন্তিত?'
'সেটাই তো বুঝতে পারছি না।'
'তোমার কারখানায় কি কোনো সমস্যা আছে?'
'সমস্যা তো আছেই। ভয়ংকর লস খেয়েছি।'
'যত ভয়ংকর লস হোক, সেই লস সামলে নেবার ক্ষমতা তো তোমার আছে। আছে না?'
'হ্যাঁ আছে।'
'সিগারেট শেষ করে ঘুমাতে যাও। কাল কথা হবে।'
'আচ্ছা।'
নবনী উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, 'চা শেষ করে তুমি সব সময় পানি খাও। কই, আজ তো খেলে না।'
শাহেদ পানির গ্লাস হাতে নিল।
নবনী ইতস্তত করে বলল, 'তুমি আমার উপর রাগ করে আছ, তাই না?'
'না।'
'মুখ দেখে বুঝতে পারছি রাগ করেছ।'
'খানিকটা করেছি। তবে সব রাগ জলে ভেসে যাবে যদি তুমি যাবার আগে আমাকে জড়িয়ে ধরে একটা চুমু খাও।'
নবনীর চোখ-মুখ শক্ত হয়ে গেল। সে অন্যদিকে তাকাল। শাহেদ বলল, 'তুমি দেখি পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেছ। আমি কি ভয়ংকর অন্যায় কিছু বলেছি?'
নবনী কিছু বলল না। দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রইল। শাহেদ বলল, 'আচ্ছা যাও—গুড নাইট, নবনী।
নবনী যন্ত্রের মতো বলল, ' গুড নাইট।'

.
বালিশ হাতে নবনী ছোট বোনের ঘরে ঘুমাতে গেল। দরজায় টোকা দিল। শ্রাবণী জেগে আছে। ঘরে বাতি জ্বলছে। তার নড়াচড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। কিন্তু সে দরজা খুলছে না। নবনী দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলল, 'এই শ্রাবণী, দরজা খোল। কী হল তোর?'
শ্রাবণী দরজা খুলল। তার চোখে-মুখে স্পষ্ট বিরক্তি। সে হতাশ গলায় বলল, 'আপা, তুমি আমার সঙ্গে ঘুমাবে?'
'হ্যাঁ। অসুবিধা আছে?'
'আছে। আমি কারো সঙ্গে ঘুমাতে চাই না। একা ঘুমাতে চাই।'
'যথেষ্ট পাগলামি করেছিস। দরজা থেকে সরে দাঁড়া।'
শ্রাবণী দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াল। করুণ গলায় বলল, 'তুমি কিন্তু দেয়ালের দিকে শোবে। আমি ঘুমাব বাইরের দিকে। এবং কাল থেকে তুমি অন্য কোথাও থাকার ব্যবস্থা করবে।'
'তোর সমস্যাটা কি?'
'সমস্যা আছে। তুমি বুঝবে না।'
'বুঝিয়ে বললেও বুঝব না?'
'না।'
'বলে দেখ। বুঝতেও তো পারি।'
শ্রাবণী হালকা গলায় বলল, 'আমি তো রাতে একনাগাড়ে ঘুমাই না আপা। কিছুক্ষণ ঘুমাই। আবার জেগে উঠি। আবার খানিকক্ষণ বই পড়ি। গান শুনি। তুমি বিরক্ত হবে।'
বই
'অবশ্যই বিরক্ত হব। আমার তো শুনেই বিরক্তি লাগছে।'
'এই জন্যেই আমি চাই না তুমি আমার সঙ্গে ঘুমাও। আমি একা থাকতে চাই।'
নবনী বিছানায় উঠতে উঠতে বলল, 'গল্পের বই পড়ে তোর মাথা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। গল্পের বই পড়া তোর বন্ধ করতে হবে। একা একা থাকার অভ্যাসটাও তোর বদলাতে হবে। দুদিন হল আমরা এখানে আছি—দুদিন তুই কি একবারের জন্যেও ডাকবাংলো কম্পাউন্ডের বাইরে গিয়েছিস?'
শ্রাবণী জবাব দিল না। হাসল।
নবনী বলল, 'আয়, বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ি। শুয়ে শুয়ে গল্প করি। শ্রাবণী বলল, 'আমার শুতে ইচ্ছে করছে না। এত সকালে আমি কখনো ঘুমাতে যাই না।'
'এক রাতে একটু ব্যতিক্রম হোক।'
শ্রাবণী বাতি নিভিয়ে ঘুমাতে এল। দুজনের জন্যে একটাই লেপ। নবনী হাসতে হাসতে বলল, 'তোর গায়ের সঙ্গে গা লেগে গেলে সমস্যা নেই তো আবার?'
'না, কোনো সমস্যা নেই।'
বই
শ্রাবণী বোনকে জড়িয়ে ধরল। এখন মনে হচ্ছে বোনের সঙ্গে ঘুমাতে পেরে সে আনন্দিত। নবনী আদুরে গলায় বলল, 'তুই দিন দিন এত অদ্ভুত হচ্ছিস কেন রে?'
শ্রাবণী জবাব দিল না। লেপের ভেতর মাথা ঢুকিয়ে নিয়ে খিলখিল করে হাসল। নবনী বলল, 'এত হাসছিস কেন?'
'তুমি আমার সঙ্গে ঘুমাচ্ছ। আমার ভালো লাগছে, তাই হাসছি।'
'একটু আগে তো উল্টো কথা বললি—আমাকে তোর ঘরে আসতেই দিতে চাস নি।'
শ্রাবণী আরো ভালোভাবে বোনকে জড়িয়ে ধরল। নবনী বলল, 'হাত ছাড়, দম বন্ধ হয়ে আসছে।'
'হোক দম বন্ধ, হাত ছাড়ব না। তুমি গল্প বল। গল্প শুনব।'
'রাতদিন গল্পের বই পড়িস তুই, আর গল্প বলব আমি—এটা কেমন কথা? বরং তুই তোর পড়া বই থেকে একটা কিছু বল, আমি শুনি।'

‘উঁহু। তুমি বলবে আমি শুনব।’
‘আমি কী বলব?’
‘যা ইচ্ছা বল। এখানে এসে তোমার কেমন লাগছে সেইটা না হয় বল। তুমি যে একা একা ঘুরে বেড়াও—কোথায় কোথায় গেলে, কী দেখলে?’
নবনী হাই তুলতে তুলতে বলল, ‘গাছপালা ছাড়া এখানে আর কী আছে? গাছপালা দেখেছি। একটা বিশাল বটগাছ দেখলাম। ঝুরি নেমে একাকার। নিচটা বাঁধানো। তোকে নিয়ে একদিন না হয় যাব। ঐ বটগাছের বাঁধানো জায়গাটায় বসে জোছনা দেখব। খুব নাকি সুন্দর।
‘কে বলেছে খুব সুন্দর?’
‘এখানকার কলেজের এক অধ্যাপক। মবিনউদ্দিন না কি যেন নাম।’
‘তার সঙ্গে দেখা হল কোথায়?’
নবনী গল্পটা বলল, বেশ গুছিয়েই বলল। বলতে গিয়ে লক্ষ করল গল্পটা বলতে তার ভালো লাগছে। শ্রাবণী শুনছেও খুব আগ্রহ করে। গল্প শেষ হবার পর শ্রাবণী বলল, ‘তুমি কি অধ্যাপক ভদ্রলোককে খুব কঠিন করে ধমক দিলে?’
‘মোটামুটি কঠিনভাবেই দিলাম
‘ভদ্রলোক কী বললেন?’
‘কিছু বলে নি। দাঁড়িয়ে ছিল চুপচাপ।’
‘ধমক দেবার পর তোমার কি মনে হয় নি
আহা, কেন ধমক দিলাম।’
‘না, মনে হয় নি। ধমক তার প্রাপ্য ছিল। কী করে সে তার সঙ্গে জোছনা দেখার জন্যে এমন একটা নির্জন জায়গায় যেতে বলে?’
‘আমি কিন্তু ভদ্রলোকের কোনো দোষ দেখছি না।’
‘দোষ দেখছিস না কেন?’
শ্রাবণী উঠে বসে হাত বাড়িয়ে টেবিল ল্যাম্প জ্বালাল। মুখ না দেখে কথা বলতে তার ভালো লাগছে না। নবনী বিরক্ত গলায় বলল, ‘বাতি জ্বালিয়েছিস কেন? বাতি নেভা।’
‘উঁহু। অন্ধকারে কথা বলতে ভালো লাগছে না। আপা, তুমি আমার যুক্তি শোন। যুক্তি শোনার পর তোমার মনে হবে ঐ অধ্যাপক ভদ্রলোক কোনো ভুল করেন নি। বরং তাঁকে ধমক দিয়ে তুমি ভুল করেছ। ত
‘যুক্তি সকালে শুনব। এখন শুনতে ইচ্ছা করছে না।
‘না, তোমাকে এখনই শুনতে হবে। এই যুক্তি আমার সকালে মনে থাকবে না। রাতের যুক্তি দিনে কাজ করে না। আপা শোন—ঐ অধ্যাপক ভদ্রলোকের কথা থেকেই মনে হচ্ছে তিনি বটগাছের কাছে প্রায়ই আসেন। এখানে বসে জোছনা দেখেন। নিশ্চয় জায়গাটা তাঁর অত্যন্ত প্রিয়—এবং জোছনাও খুব প্রিয়। তুমি কি accept করছ?’
‘করছি।’
‘ভদ্রলোক বসে ছিলেন একা একা। তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি—তুমি সেখানে উপস্থিত হবে। তিনি হঠাৎ তোমাকে দেখলেন। নির্জন জায়গা। অদ্ভুত পরিবেশ। সেখানে ঠিক স্বপ্নদৃশ্যের মতো অসম্ভব রূপবতী একজন তরুণী উপস্থিত হল। সাধারণ পরিবেশেই তোমাকে দেখলে লোকজন চমকে যায়। অস্বাভাবিক পরিবেশে তোমাকে দেখে ভদ্রলোক হতভম্ব হয়ে গেলেন। তাঁর মধ্যে এক ধরনের ঘোর সৃষ্টি হল। তাঁর কাছে এটা বাস্তব দৃশ্য না। এটা হয়ে গেল স্বপ্নদৃশ্য। তুমি হয়ে গেলে স্বপ্নের একটি মেয়ে। স্বপ্নে যা ইচ্ছা করে তাই বলা যায়। ভদ্রলোক তাই করলেন— তোমাকে নিমন্ত্রণ করলেন জোছনা দেখার জন্যে। ব্যাপারটা তোমার কাছে অস্বাভাবিক লাগলেও তাঁর কাছে মোটেই অস্বাভাবিক লাগল না। কারণ তুমি তো বাস্তবের মেয়ে না, তুমি ছিলে কল্পনার একটি মেয়ে।’
‘চুপ কর্ গাধা। আমি হলাম কল্পনার মেয়ে। সে খুব ভালো করেই জানে আমি কে। আমি ডাকবাংলোয় আছি। আমার নাম পর্যন্ত জানে।’

‘জানলেও তুমি তাঁর কাছে বাস্তবের কোনো চরিত্র না। বাস্তবের চরিত্ররা তোমার মতো সুন্দর হয় না। বাস্তবের চরিত্ররা এত সুন্দর করে সেজে একা একা বটগাছের কাছে যায় না। বটগাছের সঙ্গে গল্প করে না।

‘যথেষ্ট হয়েছে। বাতি নিভিয়ে ঘুমাতে আয়।’

শ্রাবণী বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। হালকা গলায় বলল, ‘তোমার জায়গায় আমি হলে কী করতাম জান আপা?’

‘জানি।’

‘বল তো কী করতাম?’

‘তুই বলতি—চলুন যাই। আপনার জোছনা দেখে আসি। তারপর বসে থাকতি লোকটার সঙ্গে। আমরা পুলিশ নিয়ে তোকে খুঁজে বের করে আনতাম।’

শ্রাবণী হাসতে হাসতে বলল, কিছুটা হয়েছে, পুরোপুরি হয় নি। আমি ঠিকই বলতাম, চলুন যাই। বটগাছের কাছে গিয়ে বলতাম—আপনি গিয়ে বসুন, আমি আসছি। ভদ্রলোক বসতেন আর আমি নিঃশব্দে পালিয়ে চলে আসতাম। ভদ্রলোক আর আমাকে খুঁজে পেতেন না।’

‘তাতে লাভ কী হত?’

‘ভদ্রলোকের স্বপ্নটা আরো জোরালো করে দিতাম। তাঁর কাছে সারাজীবন মনে হত—তিনি ঐ রাতে সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখেছেন।’

নবনী হাই তুলতে তুলতে বলল, ‘গল্পের বই পড়া তোর পুরোপুরি বন্ধ করা উচিত। তোর মাথা এলোমেলো হয়ে গেছে। এখন ঘুমা দেখি।

‘আচ্ছা ঘুমাচ্ছি।’

নবনী অবাক হয়ে লক্ষ করল, শ্রাবণী সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়েছে। গাঢ়, গম্ভীর ঘুম। নবনীর ঘুম আসছে না। সে জেগে আছে। জানালা গলে জোছনার আলো ঢুকেছে। সুন্দর দেখাচ্ছে। শ্রাবণীর সঙ্গে গল্প করতে ভালো লাগছিল। এখন কেমন যেন একা একা লাগছে। শাহেদ কি এখনো জেগে আছে। ঢাকায় সে অনেক রাত জাগত। এখানে কি জাগবে? শরীর খারাপ। শুয়ে পড়েছে নিশ্চয়ই।

নবনী খাট থেকে নামল। তার পানির পিপাসা পেয়েছে। সে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। বারান্দায় খুব হাওয়া। শীত লাগছে। সে খানিকক্ষণ শীত গায়ে মাখল। খুব সাবধানে এগুল শাহেদের ঘরের দিকে। ঘরে বাতি জ্বলছে। সে এখনো জেগে আছে। নবনী দরজায় হাত রাখল। দরজার ভেতর থেকে বন্ধ। সে কি ডাকবে শাহেদকে? না থাক। নবনী খাবার ঘরের দিকে এগুল।

খাবার ঘরে বাতি জ্বলছে। জাহানারা হাতলওয়ালা একটা চেয়ারে বসে উলের কি যেন বুনছেন। তাঁর পেছনে মিলু বুয়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুল বিনি করে দিচ্ছে। নবনী বলল, ‘মা ঘুমাও নি?’

‘না। ঘুম আসছে না।’

‘বসে বসে স্যুয়েটার বুনলে তো ঘুম আসবে না। বিছানায় শুয়ে ঘুমের চেষ্টা করতে হবে।’

‘চেষ্টা করে লাভ নেই।’

‘তুমি ঘুমাচ্ছ না ভালো কথা। মিলু বুয়াকে জাগিয়ে রেখেছ কেন? তাকে ঘুমাতে দাও।’

জাহানারা কিছু বললেন না। উল বুনেই যেতে লাগলেন। মিলু নবনীর দিকে তাকিয়ে ইশারায় আর কিছু না বলার জন্যে অনুরোধ করল।

৪

সুরুজ মিয়া মই নিয়ে এসেছেন।

ডাকবাংলোর পেছনে মই লাগানো হয়েছে। সুরুজ মিয়া নিজেই মই বেয়ে তরতর করে উঠলেন। নিশ্চিত হলেন যে মই আছে। মই ভেঙে পড়ে গেলে তাঁর উপর দোষ পড়বে।

শ্রাবণী বলল, 'থ্যাংকস চেয়ারম চাচা।'

সুরুজ মিয়া শুকনো মুখে বললেন, 'স্যার রাগই করেন কিনা।'

'বাবা রাগ করবে না। আপনি শুধু শুধু ভয় পাচ্ছেন।'

'আর কিছু লাগবে আম্মা? লাগলে বলবেন। লজ্জা করবেন না।'

'আপনাকে যা আনতে বলা হবে আপনি তাই আনবেন?'

'এত ক্ষমতা কি আমার আছে আম্মা! তবে চেষ্টা করব এইটা সত্য।'

'আসুন চেয়ারম্যান চাচা, আমার সঙ্গে চা খান।'

'জ্বি না আম্মা। আমি এখন যাই। স্যার ঘুম থেকে উঠলে একবার আসব। খোঁজ নিয়া যাব। আপনার কিছু লাগব কিনা তা তো আম্মা বলেন নাই। আমি হলাম আপনার বুড়ো ছেলে। ছেলেকে বলতে দোষ নাই।'

'আমার কিচ্ছু লাগবে না। ও আচ্ছা, একটা জিনিস লাগতেও পারে। এখনো বুঝতে পারছি না। আপনাকে পরে বলব।'

সুরুজ মিয়া চিন্তিত বোধ করছেন। মিনিস্টার সাহেবের ছোট মেয়েটা অন্য দশটা মেয়ের মতো না। একটু আলাদা। মাথা খারাপও হতে পারে। বড়লোকের মেয়েগুলোর মাথা একটু খারাপ এমনিতেই থাকে। আর এ হল ছোট মেয়ে—আদর পেয়েছে বেশি। এই মেয়েটা সম্পর্কে গতকাল রাতে একটা খবর পেয়ে তিনি খুবই চিন্তিত বোধ করেছেন। মিনিস্টার সাহেবকে জানাবেন কিনা বুঝতে পারছেন না। জানানো উচিত কিনা তাও বুঝতে পারছেন না। ওসি সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করতে গিয়েছিলেন। ওসি সাহেবও কোনো পরামর্শ দিতে পারলেন না—শুধু বললেন, 'চিন্তার বিষয় হয়ে গেল। লক্ষ্য রাখতে হবে।'

ব্যাপার তেমন কিছু না। পুলিশের সেন্ট্রি খবরটা দিয়েছে। সে মিথ্যা বলে নি। মিনিস্টারের মেয়েকে নিয়ে মিথ্যা বলার সাহস তার হবে না।

সে দেখেছে মিনিস্টার সাহেবের ছোট মেয়ে রাত তিনটার দিকে একটা চাদর গায়ে দিয়ে একা একা বাড়ি থেকে বের হয়ে নদীর তীর পর্যন্ত গেল। খানিকক্ষণ হাঁটল—তারপর ফিরে এল। পুলিশের সেন্ট্রি কাছে যায় নি, দূরে দূরে থেকেছে। তবে লক্ষ্য রেখেছে।

এখানে অবশ্যি ভয়ের কিছুই নেই। খুবই নিরাপদ জায়গা। তবু অঘটন ঘটতে কতক্ষণ লাগে? অঘটন যে কোনো সময় ঘটতে পারে। তবে এখন আর ভয়ের কিছু নেই। সুরুজ মিয়া নদীর পাড়ে লোক রেখে দিয়েছেন। নৌকা বাঁধা আছে। নৌকায় দুজন মাঝি। তাদের কাজ হল ডাকবাংলোর দিকে তাকিয়ে থাকা। কাউকে আসতে দেখলেই এক জন নৌকায় থাকবে, অন্যজন ছুটে এসে তাঁকে খবর দেবে। তখন না হয় মিনিস্টার সাহেবকে খবর দেয়া যাবে। ব্যাপারটা হয়তো কিছুই না। আবার হয়তো অনেক কিছু। মইয়ের ব্যাপারটা ধরা যাক। এমন কিছু না। মই দিয়ে ছাদে ওঠার শখ বড় মানুষের ছেলেপুলেদের হবেই। কিন্তু মই দিয়ে ছাদে উঠে এই মেয়ে যদি নিচে ঝাঁপ দেয় তখন অবস্থাটা কী হবে? যে মেয়ে নিশিরাতে নদীর পাড়ে যেতে পারে সে অনেক কিছুই করতে পারে। মেয়েটার মধ্যে পাগলামি আছে। ভালো রকম পাগলামি আছে। সুরুজ মিয়ার ধারণা, মেয়েটার বড় বোনের মধ্যেও আছে। সেই মেয়েও একা একা ঘুরে বেড়ায়। পাগলামি বংশগত ব্যাপার। এক জনের কারোর থাকলে সবার মধ্যে খানিকটা চলে আসে। মিনিস্টার সাহেবের মধ্যে কি আছে? সুরুজ মিয়া এখনো তা ধরতে পারেননি। তবে খানিকটা আছে বলে মনে হয়। না হলে থানার ওয়্যারলেস দিয়ে কেউ খবর পাঠায়— সুন্দরবনের বাঘের সংখ্যা কত? সুন্দরবনের বাঘের সংখ্যা দিয়ে কী হবে? কি একটা জানার বিষয়?

.

শ্রাবণী সুরুজ মিয়ার সঙ্গে বাগানে হাঁটছে। সুরুজ মিয়া মেয়েটির হাবভাব বোঝার চেষ্টা করছেন। মেয়েটাকে তো বেশ সহজ স্বাভাবিকই মনে হচ্ছে। ভয় পাওয়ার বোধহয় কিছু নেই। ঐ দিন রাতে নদীর ঘাটে একা একা কেন গিয়েছিল জিজ্ঞেস করে ফেলবেন নাকি? রেগে না গেলেই হল। হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করতে হবে, যাতে রাগতে না পারে।

'আম্মা, একটা কথা বলব?'

'বলতে ইচ্ছে করলে অবশ্যি বলবেন।'

সুরুজ মিয়া ইতস্তত করতে লাগলেন। বোধহয় বলাটা ঠিক হবে না।

শ্রাবণী বলল, 'এমন কোনো কথা যা বলতে আপনার অস্বস্তি লাগছে?'

সুরুজ মিয়া মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললেন, 'ভুলও হইতে পারে। মানুষ মাত্রই ভুল হয়।'

'বলে ফেলুন তো শুনি। এত প্যাঁচানোর কোনো দরকার নেই।'

'ইয়ে মানে—ব্যাপার হয়েছে কি—পুলিশের সেন্ট্রি আমারে বলল—আপনারে নাকি দেখেছে রাত তিনটার দিকে একা একা নদীর পাড়ে গেছেন?'

শ্রাবণী সহজ গলায় বলল, 'ঠিকই দেখেছে। আপনি এটা বলতে এত অস্বস্তি বোধ করছেন কেন?'

'না মানে, গভীর রাত!

'গভীর রাত হয়েছে তো কী হয়েছে? ভরা পূর্ণিমা। ডাকবাংলোর সঙ্গে নদী ডাকবাংলোয় পুলিশ পাহারা। কাছেই একদল আনসার, ডাকলেই ছুটে আসবে। আমি ভয় পাব কেন?'

'না, ভয়ের কিছু নাই।

'আমার অবশ্যি খানিকটা ভয় ভয় করছিল। কিন্তু এত সুন্দর লাগছিল বালির উপর চাঁদের আলো। ভাবলাম, কাছে গিয়েই দেখে আসি। আপনার ধারণা কাজটা ভুল হয়েছে?'

'জ্বি না, আম্মা। ভুল হয় নাই। তবে স্যার শুনলে রাগ করবেন।'

'বাবা শুনেছেন। সকালবেলায় বাবাকে বলেছি। বাবা রাগ করেন নি। শুধু বলেছেন—নেক্সট টাইম এমন ইচ্ছা যদি হয় তাহলে যেন এক জন সেন্ট্রি সঙ্গে করে নিয়ে যাই।'

সুরুজ মিয়া এখন খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করছেন। ব্যাপারটা যত জটিল শুরুতে মনে হয়েছিল— এখন দেখা যাচ্ছে তত জটিল নয়।

'চেয়ারম্যান চাচা!'

'জ্বি আম্মা!'

'আপনার বাড়ি এখান থেকে কত দূরে?'

'বেশি দূরে না আম্মা। কাছেই।'

'চলুন তাহলে আপনার বাড়ি থেকে বেড়িয়ে আসি।'

সুরুজ মিয়া হকচকিয়ে গিয়ে বললেন, 'শুনে খুবই আনন্দ পেয়েছি আম্মা। কিন্তু স্যারকে না জিজ্ঞেস করে আপনাকে নিতে পারব না। স্যার অনুমতি দিলে একদিন নিয়ে যাব। বাড়ির মেয়েছেলেরাও আপনাকে আর বড় আম্মাকে দেখতে চায়।'

.

শাহেদের ঘুম ভেঙেছে। সে জানালা দিয়ে দেখছে শ্রাবণী এবং টুপি মাথায় বুড়ো ধরনের একজন লোক বাগানে হাঁটছে। শ্রাবণী হাত নেড়ে নেড়ে খুব গল্প করছে। শাহেদের জ্বর শেষ পর্যন্ত আসে নি। শরীর ঝরঝরে লাগছে। রাতে না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিল। এখন প্রচণ্ড খিদে বোধ হচ্ছে। শাহেদ বিছানা ছেড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। হাত উঁচিয়ে শ্রাবণীকে ইশারা করল। শ্রাবণী এগিয়ে আসছে। তাকে রোগা রোগা লাগছে।

'গুড মর্নিং, শাহেদ ভাই।'

'গুড মর্নিং, শ্রাবণী।'

'এই মাত্র ঘুম থেকে উঠলেন?'

'হুঁ।'

'অনুমান করুন তো কটা বাজে?'

‘আটটা।’
‘হয় নি। বাজে মাত্র সাতটা। এই ব্যাপারটা আমি লক্ষ করেছি। গ্রামে এলেই দেখবেন সময় স্লো হয়ে যায়। এক ধরনের টাইম ডাইলেশন হয়। আপনার কাছে মনে হচ্ছে আটটা বাজে। আসলে বাজছে সাতটা।’
‘ঐ বুড়ো ভদ্রলোক কে?
‘উনার নাম সুরুজ মিয়া। চেয়ারম্যান। চেয়ারম্যান শুনলেই খুব খারাপ ধরনের চরিত্রের কথা মনে আসে। উনি মোটেই সে রকম নন। নিতান্তই ভালো মানুষ। আমার জন্যে মই এনে লাগিয়ে দিয়েছেন।’
‘কী এনে লাগিয়েছেন?’
‘মই। ছাদে ওঠার মই। আপনি তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে ফেলুন, আপনার জন্যে চায়ের ব্যবস্থা করে আসি। কুয়ার পাশে বসে চা খান, দেখুন কী অদ্ভুত লাগে।’
‘কুয়ার পাড়ে বসে চা খেতে হবে?’
‘কিংবা এক কাজ করা যেতে পারে। আমরা দুজন চায়ের কাপ নিয়ে ছাদে চলে যেতে পারি। আপা ঘুম ভেঙে যখন দেখবে আপনি নেই, তখন তার মাথা খারাপ হয়ে যাবে।’
‘তোমার আপা কি এখনো ঘুমাচ্ছে?’
‘মনে হয় ঘুমাচ্ছে। ডেকে তুলব?’
‘দরকার নেই। তুমি বরং চা নিয়ে এস।’
শ্রাবণী রান্নাঘরে ঢুকল। রান্নাঘরে পিঠা বানানোর চেষ্টা হচ্ছে। জাহানারা ভাপা পিঠা বানাচ্ছেন। ঠিকমতো হচ্ছে না। ভেঙে যাচ্ছে। নবনীর ঘুম ভেঙেছে। সে মুখ ধুয়ে মার পাশে বসে আছে। মাকে সাহায্য করাই তার ইচ্ছা। কোনো উপায় নেই—জাহানারা তাকে কোনো কিছুতেই হাত দিতে দিচ্ছেন না। শ্রাবণী বলল, ‘আপা শাহেদ ভাই কুয়ার পাড়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তোমাকে চা নিয়ে যেতে বলেছেন।’
নবনী লজ্জা পেয়ে গেল। জাহানারা মেয়ের এই লজ্জা উপভোগ করলেন। হাসি চাপতে চাপতে বললেন, ‘চা-টা তুই নিজেই বানিয়ে নিয়ে যা। পিঠার হাঁড়ি নামিয়ে কেতলি বসিয়ে দে।’
নবনী বলল, ‘সব তুমি করবে, চা-টাই বা শুধু শুধু আমি করব কেন? চা তুমি বানাবে।’

.

কুয়ার পাড়টা এত সুন্দর রাতে বোঝা যায় নি। কুয়ার চারপাশে চিকন চিকন পাতার অচেনা কিছু গাছ পুরো জায়গাটার উপর ছায়া ফেলে আছে। গাছের নিচ ঝকঝক করছে। একটা পাতাও পড়ে নাই। পরিষ্কার থাকারই কথা। সকাল-বিকাল দুবেলা ঝাঁট দেয়া হচ্ছে। মালী শাহেদকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দুটা ফোল্ডিং চেয়ার নিয়ে এল। শাহেদ বলল, ‘আপনাদের ডাকবাংলো খুব সুন্দর।
মালী কিছু বলল না। এমনিতে সে প্রচুর কথা বলে। এখন চেয়ারম্যান সাহেব তাকে বলে দিয়েছেন—মুখ বন্ধ রাখবি, কোনো কথা বলবি না। কি বলতে কী বলবি সর্বনাশ হয়ে যাবে। যে সে লোক আসে নাই। মন্ত্রী। জাতসাপ।
ট্রেতে করে চা, টোস্ট বিসকিট নিয়ে নবনী আসছে। এই শীতের মধ্যেও ঘুম থেকে উঠেই সে গোসল করে হালকা গোলাপি রঙের শাড়ি পরেছে। কানে মুক্তার দুল। শাড়ির রং তার গায়ের রঙের সঙ্গে মিলেমিশে গেছে। সুন্দর দেখাচ্ছে নবনীকে। তার দিক থেকে চট করে চোখ ফিরিয়ে নেয়া সম্ভব না। শাহেদ বলল, ‘আজ ভোরবেলা আয়নায় তুমি নিজেকে দেখেছ?’
‘না। কেন?’
‘না দেখে থাকলে খবরদার দেখবে না। নজর লেগে যাবে। নিজের নজর সবচে’ বেশি লাগে। আজ তোমাকে দেখাচ্ছে স্বর্গের অপ্সরীদের মতো।’
‘স্বর্গের অপ্সরীরা কি চা এবং টোস্ট নিয়ে আসে? তারা আনে অমৃত।’
‘চা এখন অমৃতের মতো লাগবে।’

শাহেদ চায়ের কাপ তুলে নিল। নবনী বলল, বিসকিট খাও। নাশতা দিতে দেরি হবে। মা ভাপা পিঠা বানানোর চেষ্টা করছেন। পিঠা জোড়া লাগছে না। লাগবে বলেও মনে হয় না। রাতে ঘুম কেমন হয়েছিল?'

'খুব ভালো ঘুম হয়েছে। এক ঘুমে রাত কাবার।'

নবনী শাহেদের সামনে বসেছে। সে তার নিজের চায়ের কাপ হাতে নিতে নিতে বলল, 'জায়গাটা কী অদ্ভুত সুন্দর, লক্ষ করেছ?'

'হ্যাঁ, লক্ষ করলাম।'

'আর কী রকম নির্জন সেটা দেখেছ?'

'হ্যাঁ।'

নবনী বলল, 'ডাকবাংলোটা গ্রামের মূল বসতি থেকে অনেকখানি দূরে। নীলকর সাহেবরা বানিয়েছিল। তারা মানুষদের কাছ থেকে দূরে থাকতে চাইত।'

শাহেদ বলল, 'এই অঞ্চলে তো নীলের চাষ হবার কথা না। নীলকর সাহেব তুমি কোথায় পেলে?'

'আমি যা শুনেছি, তাই তোমাকে বললাম। সাহেবদের কবরখানাও নাকি আছে। এক সাহেবের স্ত্রী মারা গিয়েছিলেন—তাঁর কবর আছে। কবরে চার লাইনের কবিতা আছে।'

'কবরটা কোথায়?'

'আমি জানি না। শ্রাবণী জানে।'

'ওকে বল তো আমাকে দেখাতে।'

'বলব।'

শাহেদ হাসতে হাসতে বলল, 'কোথাও বেড়াতে এসে অবশ্যি কবর দেখে বেড়ানো কোনো কাজের কথা না।

নবনী উঠে দাঁড়াল। শাহেদ বলল, 'যাচ্ছ কোথায়? বোস না।'

'নাশতার ব্যবস্থা দেখি। মা যা শুরু করেছে—আজ কেউ নাশতা খেতে পারব বলে মনে হয় না।'

'নাশতা নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই, তুমি বোস।'

নবনী বসল। শাহেদ বলল, 'সুন্দর প্রেমের কবিতা আমার মুখস্থ নেই—থাকলে এখন তোমার দিকে তাকিয়ে আবৃত্তি করতাম। তুমি এত সুন্দর কেন?'

নবনী চট করে মাথা ঘুরিয়ে নিল। তার চোখে পানি এসে যাচ্ছে। সে চোখের পানি শাহেদকে দেখাতে চায় না।

শাহেদ বলল, 'আমার দিকে তাকাও, অন্যদিকে তাকিয়ে আছ কেন?'

নবনী বলল, 'কাল রাতে আমি তোমাকে রাগিয়ে দিয়েছি। এরকম আর হবে না।'

শাহেদ হাসতে হাসতে বলল, 'তার মানে কি এই যে আমি যা চাইব তাই পাব?'

নবনী জবাব দিল না।

৫

কিছুদিন মন্ত্রিত্ব করলে বিস্মিত হবার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। মন্ত্রীরা কোনো কিছুতেই বিস্মিত হন না। জামিল সাহেবের ক্ষেত্রে তা ঘটে নি। তিনি সুরুজ মিয়ার কর্মক্ষমতায় বিস্মিত হয়েছেন এবং বিস্ময় চাপা দেবার চেষ্টা করছেন না। সুরুজ মিয়া যা করেছেন তা হল ময়মনসিংহ থেকে একটা ফ্রিজ নিয়ে এসেছেন। ফ্রিজের সঙ্গে মেকানিক। মেকানিক এখন খুটখাট করে থ্রি-পয়েন্ট প্লাগ বসাচ্ছে। সুরুজ মিয়া একটু দূরে দাঁড়িয়ে হাত কচলাচ্ছেন।

জামিল সাহেব বললেন, 'এই ফ্রিজ আপনি নিজে কিনে এনেছেন?'

'জ্বি স্যার।'

'কেন?'

'ঐদিন শুনলাম বেগম সাহেবের ঠাণ্ডা পানি খাওয়ার অভ্যাস। উনার কষ্ট হইতেছে। শোনার পর মনটা খারাপ হয়ে গেল।'

'আমরা তো দুদিন পর চলে যাব, তখন ফ্রিজ কী করবেন?'

'অসুবিধা কিছু নাই, স্যার। রেখে দিব। আপনারা হইলেন মেহমান। আমি থাকতে মেহমানের কষ্ট—এটা তো স্যার অচিন্তনীয়।

'এরকম সেবাযত্ন সব মেহমানদেরই করেন?'

'করার চেষ্টা করি, স্যার। তবে কেউ তো এদিকে আসেন না। রাস্তাঘাট ভালো না। তবু যাঁরা আসেন, যত্ন করার চেষ্টা করি। আমার ক্ষমতাও স্যার সামান্য। নাদান মানুষ।'

'আপনার ক্ষমতা মোটেই সামান্য নয়। আমি বিস্মিত হয়েছি। আপনি কি কিছু চান আমার কাছে? আপনার কোনো তদবির আছে?'

'জ্বি না স্যার, আমার কোনো তদবির নাই।

'সত্যি বলছেন তো?'

'জ্বি স্যার, সত্যি।'

ফ্রিজ লাগানো হয়েছে। হালকা শোঁ শোঁ শব্দ আসছে। পানির বোতল ভর্তি করে রাখা হয়েছে। জাহানারা স্বস্তি বোধ করছেন। অনেকদিন পর আরাম করে পানি খাওয়া যাবে। তবে ফ্রিজের রং তাঁর পছন্দ হয় নি। কটকটে হলুদ রং। তাকালেই মাথা ধরে যায়।

জাহানারা বাইরের লোকদের সঙ্গে কথাবার্তা বিশেষ বলেন না। সুরুজ মিয়ার সঙ্গে বললেন। 'এত যন্ত্রণা করার কোনোই প্রয়োজন ছিল না। ঠাণ্ডা পানি আমাকে খেতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। যাই হোক, আপনাকে ধন্যবাদ।

সুরুজ মিয়া বিনয়ে নিচু হয়ে বললেন, 'যা দরকার হবে আমাকে বলবেন বেগম সাহেব। কোনো সংকোচ করবেন না।'

'শাহেদ পাখি শিকারের কথা বলেছিল শীতের পাখি। সম্ভব হবে?'

'অবশ্যই সম্ভব হবে। এটা পাখি শিকারেরই জায়গা। গত বৎসর কমিশনার সাহেব আর তাঁর স্ত্রী এসেছিলেন। পাখি শিকারের জন্যেই এসেছিলেন।

জাহানারা বললেন, 'ব্যবস্থা করতে হবে নবনীর বাবাকে না জানিয়ে। উনি শুনলে রাগ করবেন। অতিথি পাখি মারা আইনে নিষেধ।'

'সব কথা স্যারকে জানানোর দরকার নাই। উনি কিছুই জানবেন না। আমি নৌকা, বন্দুক সব ব্যবস্থাই করে রাখব। ভোররাত্রে যাওয়া লাগবে। দুই আম্মাও কি সাথে যাবেন?'

'হ্যাঁ, ওরাও নিশ্চয়ই যেতে চাইবে।'

'কোনো অসুবিধা নাই বেগম সাব। আমি ব্যবস্থা করে খবর দিব।'

'আপনি হুট করে চলে যাবেন না। নাশতা খেয়ে যাবেন।'

'জ্বি আচ্ছা?'

সুরুজ মিয়া নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে দু একটা কাজ করলেন। বিকেলের মধ্যে খুঁটি বসিয়ে ব্যাডমিন্টন খেলার ব্যবস্থা করলেন। ব্যাডমিন্টন খেলার সাজসরঞ্জাম ঘরেই ছিল। গত বৎসর কমিশনার সাহেব ব্যাডমিন্টন খেলতে চেয়েছিলেন। সব জিনিসপত্র যখন জোগাড় হল তখন

তাঁরা চলে গেলেন। সুরুজ মিয়া যত্ন করে তুলে রেখেছিলেন। এখন কাজে লেগেছে। এ জগতে কিছুই নষ্ট হয় না। এক সময় না এক সময় কাজে লাগে। মিনিস্টার সাহেবের পেছনে তার শ্রমও বৃথা যাবে না। এক সময় কাজে লাগবে।

.

বিকেল। রোদ পড়ে এসেছে।

শাহেদ খুব আগ্রহ নিয়ে ব্যাডমিন্টন খেলছে। একদিকে শাহেদ, অন্যদিকে শ্রাবণী। নবনীকে খেলার ব্যাপারে রাজি করানো যায় নি। সে নাকি জীবনে ব্যাডমিন্টন খেলে নি। শাহেদ বলল, 'এটা এমন কোনো খেলা না যে শিখতে হয়। র‍্যাকেট হাতে নিলেই খেলা যায়। সাহস করে র‍্যাকেটটা হাতে নাও।'

নবনী বলল, 'আমার এত সাহস নেই। আমি বরং দেখি। দেখতেই আমার ভালো লাগছে।'

শ্রাবণী বলল, 'দেখতে তোমার মোটেই ভালো লাগছে না। তুমি খুব বিরক্ত হয়ে তাকিয়ে আছে।'

'মোটেই বিরক্ত হয়ে তাকিয়ে থাকছি না। তুই যে হেরে ভূত হচ্ছিস, দেখে ভালো লাগছে।'

'আপা, আমি হেরে ভূত হচ্ছি না। শাহেদ ভাই কেমন খেলে আমি বোঝার চেষ্টা করছি। যখন বোঝা হয়ে যাবে তখন বাজির খেলা খেলব। সিরিয়াস বাজি ধরে খেলা হবে।

'কী বাজি?'

'বাজির টার্মস এন্ড কন্ডিশানস পরে ঠিক করা হবে।'

শাহেদ নবনীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'প্রায় পনের বছর পর ব্যাডমিন্টন খেলছি। দারুণ লাগছে। আমি থরোলি এনজয় করছি।'

নবনী বলল, 'তাহলে এনজয় করতে থাক। আমি একটু ঘুরে আসি। খেলা শেষ হলে একসঙ্গে চা খাব।'

'ঠিক আছে। চা-নাশতা খেয়ে ইংরেজ সাহেবের স্ত্রীর কবর দেখে আসব। কোথায় যেন কবরটা?'

শ্রাবণী বলল, 'জঙ্গলের ভেতর।'

.

ডাকবাংলো থেকে একা বেরুতে বেরুতে নবনীর ইচ্ছা করছিল না। সে রান্নাঘরে ঢুকে মাকে ধরল। আদুরে গলায় বলল, বলল, 'মা, চল তো আমার সঙ্গে, ঘুরে আসবে। সারাক্ষণ রান্নাঘরে বসে থাকার জন্যে তুমি নিশ্চয়ই বেড়াতে আস নি। চল আমার সঙ্গে।'

'কোথায়?'

'পৃথিবীর সবচে' বড় বটগাছ তোমাকে দেখিয়ে আনব।'

'দিনের বেলা মনে করিস না কেন? এখন যাব কীভাবে? কাচ্চি বিরিয়ানি বসিয়েছি। এখন তো নড়াই যাবে না।'

নবনী একা একাই বের হল। গেটের বাইরে সেন্ট্রি পুলিশ দুজন একসঙ্গে স্যালুট দিল। নবনীর জানতে ইচ্ছে করল, স্যালুট দেয়ার সময় এরা কী ভাবে। কিছু নিশ্চয়ই ভাবে। তাদের ভালো লাগে না নিশ্চয়ই। আচ্ছা, এরা কি শ্রাবণীকেও স্যালুট দেয়? শ্রাবণীকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

'আম্মা, কোথায় যান?'

নবনী থমকে দাঁড়াল। সুরুজ মিয়া ছুটতে ছুটতে আসছেন।

সুরুজ মিয়ার মুখভর্তি পান। নবনীর কাছে এসে রাস্তার উপর পানের পিক ফেললেন। টকটকে লাল পিক। নবনীর মনে হল, মানুষটা রক্ত-বমি করছে।

'কোথায় যান আম্মা?'

'কোথাও না। হাঁটতে বের হয়েছি। দৃশ্য দেখছি।'

'দেখার কিছু নাই। গণ্ডগ্রাম জায়গা। কিছু গাছপালা।'

'গাছপালাই আমার কাছে খুব সুন্দর লাগছে।'

‘রাস্তা খারাপ। বড় ধুলা। হাঁটার চাইতে নদীপথে যাওয়া ভালো। নৌকা একটা তৈরি রেখেছি ঘাটে। দুজন মাঝি আছে। যখন বলবেন নিয়ে যাবে।’

‘থ্যাংক ইউ।’

‘থানার একটা স্পিডবোট ছিল। তার আবার ডিজেল নাই। মেশিনেও কি জানি গণ্ডগোল। আমি ওসি সাহেবরে বললাম মেশিন সারাই করতে। ডিজেল আনতে। প্রয়োজনে কাজে না লাগলে স্পিডবোটের ফায়দা কি।’

‘আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। বেড়াতে ইচ্ছা হলে নৌকা তো আছেই।’

‘নৌকা আম্মা চব্বিশ ঘন্টা আছে। তোশক দিয়ে বিছানা করা। যখন ইচ্ছা মাঝিকে বলবেন। আমাকেও বলতে পারেন। আমি হলাম আম্মা আপনার বুড়ো ছেলে।

সুরুজ মিয়া সঙ্গে সঙ্গে আসছেন। নবনীর ভালো লাগছে না। সে একা একা হাঁটতে চাচ্ছিল। লোকটার মুখের উপর বলতেও পারছে না আপনি চলে যান। সুরুজ মিয়ার বোধহয় যাবার ইচ্ছাও নেই। হেলতে দুলতে আসছে। মনে হয় নবনীর সঙ্গে গল্প করে আরাম পাচ্ছে। নবনী লোকটাকে কী ডাকবে ভেবে পাচ্ছে না। শ্রাবণী কত সহজভাবে চাচা ডাকে। শ্রাবণীর মতো সহজভাবে চাচা ডাকতে পারলে মন্দ হত না।

‘চেয়ারম্যান সাহেব।!’

‘জ্বি আম্মা।’

‘ইংরেজ সাহেবের স্ত্রীর যে একটা কবর আছে সেটা কোথায়?’

‘কার কবর বললেন?’

‘ইংরেজ সাহেবের স্ত্রীর কবর। যে সাহেব এই ডাকবাংলোয় থাকতেন—তাঁর স্ত্রী। মহিলার নাম মারিয়া স্টোন।’

সুরুজ মিয়া বিস্মিত হয়ে বললেন, ‘এই রকম কোনো কবর তো আম্মা এই অঞ্চলে নাই। কবরের কথা আপনেরে কে বলেছে?’

নবনী ছোট্ট নিশ্বাস ফেলল। বোঝাই যাচ্ছে কবরের ব্যাপারটা শ্রাবণীর বানানো। কোনো বইয়ে পড়েছে বোধহয়।

সুরুজ মিয়া বললেন, ‘কবরের বিষয়টা কে বলেছে?’

‘মনে পড়ছে না, কে যেন বলেছে।’

‘আচ্ছা, আমি খোঁজ নিয়া দেখব।’

‘আপনাকে খোঁজ নিতে হবে না। অন্য কোনো ডাকবাংলো সম্পর্কে শুনেছিলাম। এটার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছি।’

নবনী সড়ক ছেড়ে পায়ে চলা পথ ধরল। সুরুজ মিয়া বিস্মিত হয়ে বললেন, ‘এই দিকে কই যান?’

‘একটা বটগাছ আছে। বটগাছটা দেখতে এসেছি।’

‘বটগাছ দেখার কী আছে, আম্মা?’

‘ঢাকা শহরে তো আর বটগাছ দেখার তেমন সুযোগ নেই। সুযোগ পাওয়া গেছে যখন, দেখে যাই।’

বটগাছের সামনে এসে নবনী থমকে দাঁড়াল। আজো প্রথম দিনের মতো বলতে ইচ্ছা করল, ‘হ্যালো মিস্টার বটগাছ, কেমন আছেন? বলা হল না। সঙ্গে সুরুজ মিয়া আছেন। তাঁর সামনে চুপ করে থাকাই ভালো।’

‘এই বটগাছটার বয়স কত হবে?’

‘বলা মুশকিল, আম্মা। তবে খুব পুরোনো গাছ।’

‘গাছের গুঁড়ি বাঁধানো। কারা বাঁধিয়েছে জানেন?’

‘জ্বি না আম্মা, জানি না। আমরা ছোটবেলা থেকেই দেখতেছি এই রকম।’

নবনী বলল, ‘আসুন, ঐ খানে গিয়ে বসি।’

‘না যাওয়াই ভালো, আম্মা।

‘না যাওয়াই ভালো কেন?’
‘জংলা জায়গা। কেউ আসে না। সাপ-খোপ থাকতে পারে।’
‘শীতকালে সাপ থাকবে না। আসুন যাই।’
বটের ঝুরির ফাঁক দিয়ে নবনী চট করে ঢুকে গেল। বাধ্য হয়ে পেছনে পেছনে সুরুজ মিয়া ঢুকলেন। তিনি খুব অস্বস্তি বোধ করছেন। মেয়েটার সঙ্গে এসে দেখি একটা সমস্যায় পড়া গেছে। না এসেও উপায় ছিল না। একটা মেয়েকে এভাবে একা একা ছেড়ে দেয়া যায় না।
নবনী বটগাছের গুঁড়ির কাছে এসে অবাক হয়ে গেল। কী অদ্ভুত কাণ্ড! সে দাঁড়িয়ে আছে মাঝখানে। চারদিক বটের ঝুরি দিয়ে ঘেরা। যেন বৃক্ষের দেয়াল। মনে হচ্ছে সুন্দর একটা দুর্গ। এই দুর্গের ভেতরে কেউ আসতে পারবে না। ভেতরটা খুব পরিষ্কার। একটা শুকনো পাতাও পড়ে নেই। সিমেন্টের বাঁধানো অংশটি বেশ প্রশস্ত। ইচ্ছে করলে যে কেউ শুয়ে থাকতে পারে। কালো সিমেন্ট। দেখলেই হিম হিম ভাব হয়।
নবনী বলল, ‘কী অদ্ভুত জায়গা দেখেছেন চেয়ারম্যান চাচা?’ এই প্রথম নবনী চাচা বলল, ‘তার খুব খারাপ লাগল না।’ সুরুজ মিয়া বললেন, ‘চলেন আম্মা যাই। ‘যাই যাই করছেন কেন? বসুন না।’
‘সন্ধ্যা হইতে বেশি বাকি নাই। চলেন যাই। আরেকদিন দিনের বেলায় আসলেই হবে।’
‘সন্ধ্যা হোক। দেখি এখান থেকে সন্ধ্যা হওয়া দেখতে কেমন লাগে।’
সুরুজ মিয়া খুবই দুশ্চিন্তায় গলেন। এই মেয়ে মনে হচ্ছে সমস্যায় ফেলে দেবে। জংলা জায়গায় সন্ধ্যা পর্যন্ত বসে থাকতে চাইলে তো বিরাট সমস্যা হবে। স্যার শুনলে শুধু যে মেয়ের উপর রাগ করবেন তা না। তার উপরও রাগ করবেন। রাগ করবারই কথা।
‘চেয়ারম্যান চাচা!’
‘জ্বি আম্মা।’
‘একটা কাজ করতে পারবেন?’
সুরুজ মিয়া শংকিত গলায় বললেন, ‘কী কাজ?’
‘আমি এখানে অপেক্ষা করি। আপনি শ্রাবণীকে নিয়ে আসেন। ও দেখুক কী সুন্দর জায়গা!’
‘আম্মা কী বললেন?’
‘আমি বলছি, যদি আপনার কষ্ট না হয় তাহলে শ্রাবণীকে একটু নিয়ে আসুন।’
সুরুজ মিয়া চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়লেন। ভালো যন্ত্রণায় পড়া গেল। মেয়েটার সঙ্গে আসা বিরাট বোকামি হয়েছে। এমন বোকামি তিনি সচরাচর করেন না। পনের বছর ধরে তিনি এই অঞ্চলের চেয়ারম্যান। বোকা লোকের পক্ষে এতদিন চেয়ারম্যান থাকা সম্ভব না। আজ মনে হচ্ছে তিনি নিজেকে যত বুদ্ধিমান মনে করেন আসলে তত বুদ্ধিমান নন।
‘আম্মা চলেন, আজ যাই। আরেকদিন দিনের বেলায় ছোট আম্মাকে নিয়ে আসবেন। বটগাছ তো চলে যাবে না আম্মা, এইখানেই থাকবে। গাছের তার জায়গা ছেড়ে যাওয়ার উপায় নেই। তাছাড়া সন্ধ্যাবেলা একা একা থাকা ঠিকও না। দুনিয়া তো ভালো জায়গা না। দুনিয়া খুবই মন্দ জায়গা। আপনি হইলেন মেয়ে মানুষ। আমাকে দেখেন, পুরুষ মানুষ, বয়শ পঞ্চাশের উপর —বলতে গেলে দিন শেষ। এই আমিই সন্ধ্যার পর একা বার হই না।’
‘কেন বার হন না? ভূতের ভয়?’
‘মানুষের চেয়ে বড় ভূত আর কিছু নাই। মানুষ হইল সবচে’ বড় ভূত। দুইবার আমারে মারার চেষ্টা করেছে। একবার বেড়া ভাইঙ্গা ঘরে ঢুইকা দাও দিয়া কোপ দিল সেই বছরই পাকা দালান দিলাম। আরেকবার সইন্ধ্যাকালে…’
নবনী বলল, ‘থাক, শুনতে চাচ্ছি না। চলুন ফিরে যাই।’
সুরুজ মিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, ‘চলুন আম্মা।’
সারাপথ নবনী একটি কথাও বলল না। সুরুজ মিয়াও চুপ করে রইলেন।

.

নবনী গেট দিয়ে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল।

ডাকবাংলোর সামনে বেশ ভিড়। দুটা পাজেরো জিপ দাঁড়িয়ে আছে। একটা জিপের পেছনের চাকা পাংচার হয়েছে। চাকা বদল করা হচ্ছে। ডাকবাংলোর সামনে চেয়ার পাতা হয়েছে। চেয়ারেও দুটা দল। একটা দলের সঙ্গে আছেন জামিল সাহেব। অন্য দলটি খানিকটা দূরে। নবনীর মনে হল, বেশ উৎসব উৎসব ভাব। সন্ধ্যাবেলায় এত বড় দল কোত্থে কে এসেছে কে জানে। এরা কি এখানে থাকবে?

নবনী সবাইকে পাশ কাটিয়ে যাওয়াই ঠিক করল। ডাকবাংলোর পেছনের দরজা দিয়ে ঢোকাই ভালো। কেউ দেখবে না। লাভ হল না। সবাই তাকে দেখল। আগ্রহ এবং কৌতূহল নিয়ে তাকাল। জামিল সাহেব বললেন, 'ঐ দেখুন আমার বড় মেয়ে, ওর নাম নবনী।'

নবনী স্লামালিকুম বলবে কি বলবে না কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করল। ঠিক করল, বলবে না। এতদূর থেকে স্লামালিকুম বলা অর্থহীন। চেঁচিয়ে বলতে হবে। এরচে' মাথা নিচু করে হেসে ঘরে ঢুকে পড়াই ভালো।

পেছনের দরজা দিয়ে ঢোকার সময় প্রথমই শ্রাবণীর ঘর পড়ে। ঘরে বাতি জ্বলছে। দরজা খোলা। শ্রাবণী মোড়ায় বসে আছে। টিনের বড় গামলা ভর্তি গরম পানিতে তার বাঁ পা ডুবানো। শ্রাবণীর হাতে বই, তবে গল্পের বই না। পাঠ্যবই। ফিজিক্সের বই।

বই

`নবনী বলল, 'তোর কী হয়েছে?'

'পা মচকে ফেলেছি। শাহেদ ভাইয়ের একটা রং সার্ভিস রিটার্ন করতে গিয়ে—পা পিছলে আলুর দম।'

'বেশি ব্যথা পেয়েছিস?'

'সিরিয়াস ব্যথা পেয়েছি। বিকট চিৎকার। মার ধারণা, পা ভেঙে ফেলেছি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বুক ধড়ফড় শুরু হল। ইন্টারেস্টিং এক সিচুয়েশন। শাহেদ ভাই এমন মন খারাপ করলেন যেন তিনি নিজেই ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেট দিয়ে বাড়ি মেরে আমার পা ভেঙেছেন।'

নবনী বলল, তোকে দেখে তো কিছু বোঝা মুশকিল। আসলে পা ভাঙে নি তো?'

'না ভাঙে নি। ফোলা কমে গেছে। ভাঙলে এত তাড়াতাড়ি ফোলা কমত না।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে নবনী বলল, 'আচ্ছা ভালো কথা ইংরেজ মহিলার কবরটা যেন কোথায়?'

শ্রাবণী হাই তুলতে তুলতে বলল, 'কাছেই।'

'নিয়ে যাবি আমাকে?

'পা ফেলতে পারি না। নিয়ে যাব কীভাবে?'

'মহিলার কবর যে বুঝলি কী করে?'

'নাম লেখা আছে। মারিয়া স্টোন না কি যেন। নারে শেষে কবিতা আছে।'

'কী কবিতা?'

'The bells will ring
The birds will sing.'

'রিং-এর সঙ্গে সিং-এর সহজ মিল।

শ্রাবণী বলল, 'স্বামী বেচারা নিজেই বোধহয় লিখেছে, ভালো মিল পায় নি। কবর নিয়ে এত কথা জিজ্ঞেস করছ কেন?

'এমনি।'

নবনী মার খোঁজে গেল। জাহানারা রান্নাঘরে ছিলেন না। বিছানায় শুয়ে ছিলেন। ঘর অন্ধকার। তাঁর মাথার কাছে মিলু বুয়া দাঁড়িয়ে আছে। সন্ধ্যার পর থেকে সে সব সময় মার কাছে থাকবে। নবনী বলল, 'মা তুমি রান্নাঘর থেকে নির্বাসিত। ব্যাপার কি বল তো?'

জাহানারা ক্লান্ত গলায় বললেন, 'মাথাটা হঠাৎ ঘুরে উঠল। প্রেসার বেড়েছে বোধহয়।

প্রেসার মেপে দেব?'

'না। তুই আমাকে ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানি খাওয়া।'

নবনী ঠাণ্ডা পানি নিয়ে এল। জাহানারা পানি খেয়ে আবার শুয়ে পড়লেন। নবনী বসল মার পাশে। জাহানারা মেয়ের কোলে একটা হাত রাখলেন। নরম গলায় বললেন, ‘এতক্ষণ শাহেদ ছিল। তুই আসার একটু আগে গেল। তোর খোঁজেই বোধহয় গিয়েছে।’
‘আমাকে কোথায় খুঁজবে?’
‘কি না কি এক বটগাছ আছে। তোর সেখানে যাবার কথা। শ্রাবণী ওকে তাই বুঝিয়েছে।’
‘মা, শ্রাবণী যে প্রচুর মিথ্যা কথা বলে তুমি জান?’
‘এই বয়সে সবাই মিথ্যা বলে।’
‘আমি বলতাম?’
‘বলেছিস নিশ্চয়ই। এখন মনে নেই।’
‘শ্রাবণী বানিয়ে বানিয়ে বলেছে— এখানে কোন জঙ্গলের মধ্যে নাকি এক ইংরেজ মহিলার কবর আছে। মারিয়া স্টোন নাম।’
‘আমাকেও বলেছে।’
‘ওর হাবভাব আমার ভালো লাগছে না, মা।’
‘ওকে নিয়ে চিন্তা করিস না। ও ঠিকই আছে। আয়, আমরা অন্য কিছু নিয়ে কথা বলি।
‘কী নিয়ে কথা বলতে চাও?’
‘তোকে নিয়ে বলি। আজ শাহেদ তোর বিয়ের ব্যাপারে কথা বলল।’
‘নিজ থেকেই বলল, নাকি তুমি জিজ্ঞেস করলে?’
‘নিজ থেকেই বলল, তার মা খুব অসুস্থ। তার মা চাচ্ছেন বিয়েটা তাড়াতাড়ি হোক।’
‘সে তো তার মায়ের অসুখের কথা কিছু বলে নি।’
‘শাহেদ কখনো তার সমস্যার কথা বলে না। ও অনেকটা আমার মতো।’
নবনী হাসতে হাসতে বলল, ‘তোমার কি কোনো সমস্যা আছে, মা?’
‘আছে।’
‘কী সমস্যা?’
‘শুনতে চাস?’
‘হুঁ চাই। আমার ধারণা, তুমি এই পৃথিবীর একমাত্র সমস্যাবিহীন মহিলা। একটা পরিষ্কার রান্নাঘর। রান্নার জিনিসপত্র এবং ফ্রিজের ঠাণ্ডা পানি। এই কটা জিনিস পেলেই তোমার হয়ে গেল।’
জাহানারা বিছানায় উঠে বসলেন। নবনী লক্ষ করল, তার মা উত্তেজনায় অল্প অল্প কাঁপছেন। নবনী বলল, ‘কী ব্যাপার মা?’
‘না, কোনো ব্যাপার না। তুই আমার সমস্যার কথা শুনতে চেয়েছিস। সমস্যা শুনে যা।’
‘থাক মা, আমি কিছু শুনতে চাচ্ছি না। তুমি এরকম করছ, আমার ভালো লাগছে না। মিলু বুয়া, তুমি মাকে এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি এনে দাও তো।’
জাহানারা আবার শুয়ে পড়লেন। ক্লান্ত গলায় বললেন, ‘তোর এবং শ্রাবণীর বিয়ে হবার জন্যে আমি অপেক্ষা করছি। বিয়ে হয়ে গেলেই আমার দায়িত্ব শেষ—তখন…’
‘তখন কী?’
জাহানারা বললেন, ‘এখন ঘর থেকে যা। কথা বলতে ভালো লাগছে না।’

৬

জামিল সাহেব খুবই উত্তেজিত ভঙ্গিতে বসে আছে। উত্তেজিত এবং আনন্দিত। সুরুজ মিয়া চেয়ারম্যান একজন হরবোলা খবর দিয়ে এনেছেন। চল্লিশ পঁয়তাল্লিশের মতো বয়স। বড় বড় চোখ। ভয়ংকর রোগা। অতিরিক্ত লম্বার কারণেই বোধহয় খানিকটা কুঁজো। খালি পা। সবুজ একটা লুঙ্গি পরনে। এই শীতেও গায়ে পাতলা একটা ফতুয়া ছাড়া কিছু নেই।

নবনী এসে বসল বাবার পাশের চেয়ারে। শ্রাবণীও এল খোঁড়াতে খোঁড়াতে। শাহেদও আছে। সে একটু দূরে বসেছে। মনে হয় তেমন উৎসাহ বোধ করছে না। দুটি পাজেরো জিপে অতিথি যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের একদল চলে গেছেন। অন্য একটা দল এখনো আছেন। মনে হয় তারা থেকে যাবেন।

শ্রাবণী বলল, ‘ব্যাপার কি?’

সুরুজ মিয়া বললেন, ‘ব্যাপার নিজের কানে শোনেন আম্মা। এর নাম মোস্তাক হরবোলা। দুনিয়ার যত ডাক আছে মোস্তাক জানে। বাড়ি নবীনগর, খবর দিয়া আনছি।’

মোস্তাক কদমবুসি করতে এগিয়ে এল। নবনী ‘কী সর্বনাশ!’ বলে লাফিয়ে সরে যেতে গিয়েও যেতে পারল না। মোস্তাক শুধু যে নবনী এবং শ্রাবণীকে সালাম করল তা নয়, উপস্থিত সবাইকে আরেকদফা করল। কেউ তেমন আপত্তি করছে না। সবাই মজা পাচ্ছে।

সুরুজ মিয়া বললেন, ‘মোস্তাক, শুরু কর।’

মোস্তাক দুহাত দিয়ে মুখ ঢাকল। হরবোলার ডাক দেবার সময় মুখ দেখানোর নিয়ম নেই। হাত দিয়ে মুখ ঢেকে রাখতে হয়। মোস্তাক যন্ত্রের মতো গলায় বলল,

উপস্থিত হাজেরাইন। আমার নাম হরবোলা মোস্তাক। বাড়ি নবীনগর।

পিতার নাম ইসহাক আলি। মা আমেনা বেগম। এক্ষণ শুনবেন পাখির ডাক। পাখির মধ্যে সেরা পাখি হইল কাউয়া। ভদ্র সমাজ যারে বলেন কাক।

মোস্তাক কাক ডাকতে লাগল। নবীন এবং শ্রাবণী স্তম্ভিত। এ তো সত্যি কাকের ডাক। মানুষের ডাক এ হতেই পারে না। কোনো মানুষের পক্ষে কাকের এমন ডাক অনুকরণ সম্ভব নয়।

‘ভদ্র সমাজ, কাকের বন্ধু হইল গিয়া আফনের কোকিল পক্ষী। দেখতে কাকের মতো। চেহারা আসল না, ভদ্রসমাজ আসল হইল গুণ। এইবার শোনেন কোকিল পক্ষীর ডাক।

মোস্তাক কোকিল ডাক ডাকতে শুরু করল। শ্রাবণী মুগ্ধ গলায় বলল, ‘আশ্চর্য! খুবই আশ্চর্য হবার মতো ব্যাপার!’

‘ভদ্র সমাজ, উপস্থিত হাজেরাইন। কোকিল পক্ষীর ডাক এক মতোন না।

একেক সমুয়ে একেক মতো। শীতকালে এক ডাক ডাকে, গরম কালে পৃথক এক ডাক ডাকে।

হরবোলা মোস্তাক বিভিন্ন ঋতুতে কোকিলের ডাক ডাকল। শ্রাবণী আবার বলল, ‘আশ্চর্য! খুবই আশ্চর্য হবার মতো ব্যাপার।’

পাখির পর হল পশুর ডাক—গুরু, ছাগল, শেয়াল।

তারপর হল পতঙ্গের ডাক—ঝিঁঝি পোকা, মৌমাছি, মশা, বোলতা।

জামিল সাহেব বললেন, ‘তুমি বাঘের ডাক পার না?’

‘জ্বি না স্যার। বাঘের ডাক কোনোদিন শুনি নাই। শুনলে পারব।’

সুরুজ মিয়া বললেন, ‘একবার শুনলেই পারবে। বড়ই ওস্তাদ। এ স্যার মানুষের ডাকও পারে।’

নবনী বলল, ‘মানুষের ডাক আবার কী?’

মোস্তাক আলি বলল, ‘আছে, মানুষের ডাকও আছে।’

শ্রাবণী বলল, ‘দেখি শোনান তো। আমি মানুষের ডাক শুনতে চাই।’

‘শুনলে আফনে রাগ হইবেন।’

শ্রাবণী বিস্মিত হয়ে বলব, ‘কী অদ্ভুত কথা, শুনলে রাগ হব কেন?’

মোস্তাক সঙ্গে সঙ্গে অবিকল শ্রাবণীর মতো গলায় বলল, 'কী অদ্ভুত কথা, শুনলে রাগ হব কেন?'
সবাই বিস্ময়ে দীর্ঘ সময় চুপ করে রইল। সবার আগে কথা বললেন জামিল সাহেব। তিনি হতচকিত গলায় বললেন, 'মানুষের ভয়েসের এমন রিপ্রডাকশান যে হতে পারে, আমার ধারণার বাইরে ছিল। অবিশ্বাস্য' uncanny.
তিনি মানিব্যাগ বের করে দুটা নতুন একশ টাকার নোট এগিয়ে দিলেন। মোস্তাক আবার কদমবুসি করে টাকা নিল। কদমবুসি একজনকে করল না, সবাইকে করল।
সুরুজ মিয়া তৃপ্ত গলায় বললেন, 'এর চেহারা ভালো মানুষের মতো, কিন্তু আসলে বিরাট বদ। কেউ মারা গেলে সে করে কি- রাত-দুপুরে ঐ বাড়িতে উপস্থিত হয়। মরা মানুষের গলায় ঐ বাড়ির লোকজনের নাম ধরে ডাকে। বাড়ির ভেতরে তখন ভয়ে কান্দাকাটি শুরু হয়ে যায়। কত মার খেয়েছে বলার নাই। একবার তো মারতে মারতে হাত ভেঙে দিল।'
মোস্তাক আলি মনে হচ্ছে তার মার খাওয়ার কথা শুনে খুব মজা পাচ্ছে। খিকখিক করে হাসছে।'
শ্রাবণী বলল, 'বাবা, আমি উনার পারফরমেন্সে মুগ্ধ হয়েছি। আমি কি আমার নিজের পক্ষ থেকে উনাকে কিছু গিফট দিতে পারি?'
'অবশ্যই পার।'
শ্রাবণী গিফট আনার জন্যে উঠে গেল। নবনী লক্ষ করল, শ্রাবণী এখন আর খুঁড়িয়ে হাঁটছে না। ঠিকমতোই হাঁটছে। মনে হয় পায়ের ব্যথা সেরে গেছে। শ্রাবণী সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এল। তার হাতে দুটা পাঁচশ টাকার নোট। সে মোস্তাক আলির দিকে নোট দুটি এগিয়ে দিয়ে বলল, 'আমার এই উপহার গ্রহণ করলে আমি খুব খুশি হব।'
মোস্তাক চোখ বড় বড় করে সবার দিকে তাকাচ্ছে। হাত বাড়াচ্ছে না। সে পুরোপুরি হকচকিয়ে গেছে। জামিল সাহেব বললেন, 'ও দিচ্ছে, তুমি নিচ্ছ না কেন?' নাও।'
মোস্তাক টাকা নিয়ে তৎক্ষণাৎ শিশুদের মতো শব্দ করে কাঁদতে শুরু করল। সে তার দীর্ঘ জীবনে এক সঙ্গে কখনো এত টাকা পায় নি। শ্রাবণী দাঁড়াল না, নিজের ঘরে চলে গেল।
সুরুজ মিয়া বিব্রত গলায় বললেন, 'কাঁদছিস কেন রে গাধা? কান্না বন্ধ কর্। মোস্তাক আলি আরো শব্দ করে কাঁদতে লাগল। সুরুজ মিয়া মোস্তাকের হাত ধরে তাকে বাইরে নিয়ে এলেন।
.
শ্রাবণীর ঘরের দরজা বন্ধ!
জামিল সাহেব দরজায় টোকা দিয়ে বললেন, 'আসব মা?'
শ্রাবণী বলল, 'এস বাবা।'
জামিল সাহেব ঘরে ঢুকলেন। মেয়ের বিছানায় পা তুলে বসলেন। তাঁর হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। তিনি বললেন, 'তোর ঘরে সিগারেট খাবার অনুমতি আছে তো?'
'অনুমতি নেই, তবে তুমি খেতে পার।'
'জানালাটা ভালো করে খুলে দে, ধোঁয়া চলে যাবে।'
শ্রাবণী জানালা খুলে দিল। জামিল সাহেব বললেন, 'তোর সুন্দরবনের বাঘের খবর চলে এসেছে। লাস্ট সেনসারি রিপোর্ট। বাঘ-বাঘিনীর সংখ্যা সবই আছে। এই সঙ্গে স্পটেড ডিয়ারের সংখ্যাও আছে। এই যে কাগজটায় লেখা।'
'থ্যাংকস বাবা। মেনি থ্যাংকস।'
জামিল সাহেব সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে বললেন, 'নবনীকে দেখছি না। নবনী কোথায়?'
'শাহেদ ভাইয়ের সঙ্গে নদীর দিকে হাঁটতে গেছে।'
'ও দেখি সারাদিন হাঁটাহাঁটির মধ্যেই আছে। তোর হাঁটতে ভালো লাগে না?'
'না।'
'তোর পায়ের অবস্থা কি? ব্যথা সেরেছে?'

'হুঁ।'
জামিল সাহেব চুপচাপ সিগারেট টানতে লাগলেন। শ্রাবণী বলল, 'বাবা, আমার মনে হয় তুমি আমাকে কিছু বলতে এসেছ। এখন বুঝতে পারছ না বলা ঠিক হবে কিনা। দ্বিধার মধ্যে পড়েছ। বলে ফেল।
জামিল সাহেব বললেন, 'একটু আগে তুই যে কাণ্ডটা করেছিস তা আমার পছন্দ হয় নি। সেই কথাই বলতে এসেছি।'
'কোন কাণ্ডের কথা বলছ? হরবোলাকে যে এক হাজার টাকা দিয়েছি, সেটা?'
'হ্যাঁ। এক হাজার কেন, ইচ্ছে হলে তুই পাঁচ হাজার টাকা দিবি—সেটা কোনো কথা না। কিন্তু যেখানে আমি দুশ টাকা দিয়েছি সেখানে তুই আমাকে ডিঙিয়ে এক হাজার টাকা দিলি। তুই আমাকে ছোট করলি।'
'বাবা, আমি ওর কাণ্ডকারখানা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। আমি ভেবেছিলাম, আমরা যেমন মুগ্ধ হয়েছি, তুমিও লোকটাকে ঠিক সে রকম মুগ্ধ করবে। কিন্তু তুমি তাকে মাত্র দুশ টাকা দিলে। আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল।'
'এই দরিদ্র দেশে দুশ টাকা মাত্র না মা। তোর কাছে মাত্র মনে হয়েছে। ওর কাছে এই ছিল অপ্রত্যাশিত। ও প্রচণ্ড রকম খুশি হয়েছিল।'
'হ্যাঁ, খুশি অবশ্যি হয়েছিল। কিন্তু তুমি তার খুশি হবার ক্ষমতা অতিক্রম করতে পার নি। আমি করেছি। এক হাজার টাকা পেয়ে কি রকম ভেউ ভেউ করে কাঁদছিল। ওর কান্না দেখে আমার নিজের চোখে পানি এসে গেল। যে কাজটা আমি করলাম সে কাজটা তুমি কেন করতে পারলে না? তোমার তো টাকার অভাব নেই।'
'টাকা থাকলেই সব সময় এমন দেয়া যায় না। পাবলিক ফিগারদের দিকে সবার চোখ থাকে। সবাই বলবে, জামিল সাহেব দুহাতে টাকা ছড়ায়। কোথায় পায় এত টাকা?
'কে কি ভাববে না ভাববে তাই মেনে আমাদের চলতে হবে?'
'তোমাকে না চললেও চলবে। কিন্তু আমাকে চলতে হবে।'
শ্রাবণী নিচু গলায় বলল, 'বাবা, আমি তোমাকে হার্ট করে থাকলে ক্ষমা চাচ্ছি। আমি কাউকেই হার্ট করতে চাই না। কিন্তু আমার ভাগ্য এত খারাপ যে সবাইকেই হার্ট করি।
জামিল সাহেব উঠতে উঠতে বললেন, 'আচ্ছা ঠিক আছে। এটা এমন কিছু না। Let us forget it.'
শ্রাবণী কাঁদছে। বাবা কঠিন কিছু বললেই তার চোখে পানি আসে।

৭

একটু আগে চাঁদ উঠেছে। আলো এখনো স্পষ্ট হয় নি। স্বপ্ন স্বপ্ন আলো। নবনী এবং শাহেদ হাঁটছে। নবনী তার অভ্যাসমতো মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁটছে। পায়ের নিচে চকচকে সাদা বালি। নবনীর মনে হচ্ছে চিনির দানার উপর দিয়ে হাঁটছে। খানিকটা বালি এনে জিভে ছোঁয়ালে মিষ্টি লাগবে। নবনী নিচু হয়ে কিছু বালি হাতে নিল। শাহেদ বলল, 'কী করছ?'
'কিছু করছি না। বালি নিয়ে খেলছি। তুমি হাতে নিয়ে দেখ কী ঝকঝকে বালি! হাত পাত, তোমার হাতে কিছু বালি দিয়ে দি।'
শাহেদ বলল, 'শ্রাবণীর মধ্যে তো আছেই, তোমার মধ্যেও অনেক ছেলেমানুষি আছে।'
নবনী বলল, 'আমাদের সবার মধ্যেই আছে। তোমারও আছে।'
'থাকলেও চাপা পড়ে আছে। পাথর চাপা।'
'পাথরটা সরিয়ে ফেল। তারপর আমার সঙ্গে কিছু ছেলেমানুষি কর।
শাহেদ হাসতে হাসতে বলল, 'কী করতে বলছ?'
তোমার যা করতে ইচ্ছা হয় কর। জুতা খুলে ফেলে চল আমরা ঐ চরে চলে যাই। মাঝখানে পানি খুব অল্প। হাঁটু-পানিও না।'
'চল যাই।'
তারা চরে গিয়ে উঠল। চরের বালি আরো পরিষ্কার। ঝকঝক করছে। নবনী বলল, 'তোমার কাছে কি মনে হচ্ছে না সাদা চাদর বিছানো?'
'আমার কাছে বালি বিছানো বলেই মনে হচ্ছে। ছেলেরা বাই নেচার প্রাকটিক্যাল ধরনের হয়। কল্পনাবিলাস ছেলেদের এমনিতে কম। আমার আরো কম। আমি হলাম ব্যবসায়ী মানুষ।
'ব্যবসায়ী মানুষের কল্পনাশক্তি থাকে না?
'খুব কম থাকে। তুমি একজন কবি-সাহিত্যিকের নাম বলতে পারবে না যে ব্যবসায়ী। চরের বালি দেখে আমার জানতে ইচ্ছে হচ্ছে বাণিজ্যিকভাবে এই বালি নিয়ে বিক্রি করা যায় কিনা।
'কেন বাজে রসিকতা করছ? এস বসি।'
'তোমার সুন্দর শাড়ি নষ্ট হয়ে যাবে না?'
'হোক নষ্ট।'
তারা পাশাপাশি বসল। নবনী হালকা গলায় বলল, 'তুমি হঠাৎ চলে আসায় আমি যে কী পরিমাণ খুশি হয়েছি তা কোনোদিন তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। আমার ছুটিটাই অন্য রকম হয়ে গেছে।'
'তোমার ভাবভঙ্গি দেখে আমি অবশ্যি কিছু বুঝতে পারি নি। শ্রাবণী বরং অনেক হৈচৈ করেছে।'
'আমি শ্রাবণীর মতো না। আনন্দিত হলেও চুপ করে থাকি। কষ্ট পেলেও চুপ করে থাকি।'
'গাছের মতো?'
'হ্যাঁ, গাছের মতো। নিজের আনন্দ বা দুঃখের কোনো কথাই কাউকে জানাতে ইচ্ছা করে না।'
শাহেদ সিগারেটের প্যাকেট বের করতে করতে বলল, 'একজন কেউ বোধহয় থাকা দরকার যাকে সব কথা বলা যায়।'
'হয়তো দরকার। আমি ঠিক করেছি কি জান? আমি সারা জীবনে শুধু এক জন মানুষ রাখব যাকে সবকিছু বলব। কখনো দ্বিতীয় কেউ থাকবে না।'
'সেই ভাগ্যবান এক জনটি কি আমি?'
নবনী ছোট করে নিশ্বাস ফেলে বলল, 'এখনো ঠিক জানি না।'
'এখনো জানি না মানে!'
'সত্যি জানি না।'
'যে ছেলেটিকে তুমি দুদিন পর বিয়ে করতে যাচ্ছ তাকে তুমি সব কথা বলতে পারবে না?'
'হয়তো পারব। কিন্তু আমি এখনো জানি না। স্বামী হলেই তাকে সব কথা বলা যায় তা তো না। বেশিরভাগ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কিন্তু অনেক দূরত্ব থাকে। আমার বাবা-মাকে দিয়েই দেখি—তাঁরা

দীর্ঘদিন পাশাপাশি বাস করছেন। রাতের পর রাত একই খাটে ঘুমাচ্ছেন। বাবার অসুখ হলে মা রাত জেগে সেবা করছেন। কিন্তু কী ভয়ঙ্কর দূরত্ব তাঁদের মধ্যে! আমার ধারণা, মা সারা জীবন এমন কাউকে পান নি যাকে সব কথা বলতে পারেন, আবার বাবাও হয়তো কাউকে পান নি যাকে সব বলতে পারেন।'

'তাঁদের হয়তো দরকার নেই।'

'হ্যাঁ, তাও হতে পারে। তাদের হয়তো প্রয়োজন নেই কিন্তু আমার আছে। আমি একজন কাউকে আমার সব কথা বলতে চাই।'

শাহেদ সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বলল, 'আমাকে বিবেচনার মধ্যে রাখতে পার। তোমার সব গোপন কথা শুনতে হলে কী সব গুণাগুণ থাকতে হবে তা অবশ্যি জানি না।'

'তুমি আমার কথাগুলি খুব হালকাভাবে নিচ্ছ।'

'হালকাভাবে নিচ্ছি না নবনী। আমি খুব সিরিয়াসলি নিচ্ছি। তোমাকে আমি ঠিক বুঝতে পারি না।'

'বুঝতে না পারার মতো কী করলাম?'

'অনেক কিছুই তুমি কর। তুমি আমাকে কনফিউজ করতে চাও।'

'একটা উদাহরণ দাও!'

'থাক, উদাহরণ দিতে চাচ্ছি না।'

নবনী বলল, 'তোমার কিছু মনে পড়ছে না বলে উদাহরণ দিতে পারছ না। মনে পড়লে নিশ্চয়ই দিতে।

শাহেদ বলল, 'মনে পড়লেও দিতাম না। উদাহরণ দেয়া মানে ঝগড়া করা। এখানে আমি ঝগড়া করতে চাই না। আমি অন্য কিছু চাই।'

নবনী ক্ষীণ গলায় বলল, 'কী চাও?'

তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই তুমি বলেছিলে, আমি যা চাব তাই পাব।'

নবনী বলল, 'চল উঠা যাক। আমাদের নিতে আসছে।

'কে নিতে আসছে?'

'রহমত ভাই আসছে— ঐ দেখ।'

নবনী উঠে দাঁড়াল। রহমত লম্বা লম্বা পা ফেলে এদিকেই আসছে। শাহেদ বলল, 'ওকে চলে যেতে বল। আমার বসে থাকতে ভালো লাগছে। বসি আরো কিছুক্ষণ।'

নবনী বলল, 'আমার বসে থাকতে ভালো লাগছে না। শীত লাগছে।'

শাহেদ বলল, 'মনে হচ্ছে হঠাৎ তুমি আমার উপর রেগে গেছ। তোমাকে রাগানোর মতো কিছু কি করেছি?'

নবনী জবাব দিল না। ডাকবাংলোর দিকে হাঁটতে শুরু করল। পেছনে পেছনে শাহেদ আসছে। চাঁদের আলো এখন আরো পরিষ্কার হয়েছে। অস্পষ্ট ছায়া ছায়া ভাব দূর হয়েছে।

.

ঘরে ঢুকে নবনী দেখল জাহানারা শোবার ঘর অন্ধকার করে শুয়ে আছেন। তাঁর মাথার চুলে বিলি করে দিচ্ছে মিলু বুয়া। নবনী বলল, 'কী হয়েছে?' জাহানারা বললেন, 'মাথা কেমন জানি করছে। তোরা খেয়ে নে। আমি উঠতে পারব না।'

'বেশি খারাপ লাগছে, মা?'

জাহানারা জবাব দিলেন না। নবনী বলল, 'ডাক্তারকে খবর দিতে বলব?'

জাহানারা বিরক্ত গলায় বললেন, 'কাউকে খবর দিতে হবে না। তুই যা।'

নবনী বের হয়ে এল। জাহানারা মিলুকে দরজা বন্ধ করে দিতে বললেন। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ হয়ে গেল।

রাতে শ্রাবণীও কিছু খেল না। তার নাকি গলা ব্যথা করছে। খাবার টেবিলে জামিল সাহেবও গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন। নবনী বলল, 'তোমারও কি শরীর খারাপ লাগছে বাবা?'

'না, আমার শরীর ঠিকই আছে। তোর মাকে নিয়ে সমস্যা। রাতে ঘুমায় না। জেগে বসে

থাকে। কাল রাত তিনটার সময়ে উঠে দেখি সে ডাইনিং হলে বসে আছে। উলের কি যেন বানাচ্ছে। আমি বললাম, কী বানাচ্ছ? সে বলল, কিছু না।'
নবনী বলল, 'নতুন জায়গায় মার ঘুম আসে না।'
জামিল সাহেব তিক্ত গলায় বললেন, 'নতুন জায়গা পুরাতন জায়গা কিছু না—কোনো জায়গাতেই তার ঘুম আসে না। বাড়িতেও তো ঘুমায় না।'
শাহেদ বলল, 'ভালো কোনো ডাক্তার-টাক্তার দেখানো দরকার মনে হয়।'
জামিল সাহেব বললেন, 'ভালো ডাক্তারের তো অভাব নেই। প্রচুর আছে। দেশে আছে। বিদেশে আছে। দেখাতে না চাইলে কীভাবে কী করব! ছুটি কাটাতে এসে যদি এমন অসুখ-বিসুখের যন্ত্রণায় পড়ি তাহলে ভালো লাগে? রান্না ছাড়াও তো এই পৃথিবীতে আরো কাজকর্ম আছে!'
নবনী বলল, 'বাবা, তুমি বেশি রেগে যাচ্ছ।'
'আমি খুব কম রেগেছি, মা, খুবই কম। আমি সবাইকে সবার মতো থাকতে দেই। কারোর ছুটি নষ্ট করতে চাই না। আমার থিওরি হল—বেড়াতে এসেছি। বেড়াতে এসে যে যেভাবে আনন্দ পেতে চায়—পাক। তোর মা রান্নাঘরে দরজা বন্ধ করে বসে থাকতে চাচ্ছে— থাক। শ্রাবণী একবার রাত তিনটার সময় একা একা নদীর পাড়ে গেল। আমি রাগ করেছি, কিন্তু কিছুই বলি নি। এখন শুনলাম সে একটা মই জোগাড় করেছে— ছাদে উঠবে। ছাদ এমন কী জিনিস যে মই এনে উঠতে হবে?'
নবনী হেসে ফেলল। মেয়ের হাসিমুখ দেখে জামিল সাহেবও কিছুক্ষণের মধ্যে হেসে ফেললেন। শাহেদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'পারিবারিক অনেক সমস্যা তোমার সামনেই আলাপ করলাম। তোমাকে পরিবারের এক জন ধরি বলেই তা করেছি। আমি আমার সমস্যা বলে বেড়াই না। ইচ্ছাও করে না। সময়ও নেই।'
শাহেদ প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্য বলল, 'এত জায়গা থাকতে আপনি এখানে ছুটি কাটাতে কেন এসেছেন, চাচা?'
'যুবক বয়সে একবার এখানে এসেছিলাম। পাখি শিকারের জন্যে এসেছিলাম। এই ডাকবাংলোয় ছিলাম। এখান থেকে দশ মাইল দূরে 'মাহিন্দার জলা' নামে একটা বিলের মতো আছে। সেখানে পাখি শিকারের জন্যে গিয়েছিলাম। অদ্ভুত দৃশ্য! আবারো সেই দৃশ্য দেখার জন্যেই এসেছি। দৃশ্য কি দেখব—যন্ত্রণায়-যন্ত্রণায় অস্থির!'
'এবারো কি পাখি শিকারে যাবেন?'
'পাগল হয়েছ। মন্ত্রী হয়ে পাখি শিকারে গেলে উপায় আছে? সব পত্রিকায় ফ্রন্ট পেজে ছবি চলে যাবে। তবে তোমরা যাও, দেখে আস। পাখি শিকারের দরকার নেই। ব্যাপার কি দেখে আস। থানার একটা স্পিডবোট আছে। নষ্ট ছিল। ঠিক করেছে। কাল ভোরে তোমাদের নিয়ে যাবে।'
'আপনি যাবেন না?'
'না, আমি যাব না। আমি সঙ্গে থাকলে তোমরা মন খুলে হৈচৈও করতে পারবে না। তাছাড়া এদিকে আমার কিছু কাজও আছে।'
শাহেদ বলল, 'বেড়াতে এসেছেন, এখন আবার কাজ কি? আপনিও চলুন। সবাই মিলে হৈচৈ করে আসি।'
জামিল সাহেবের খাওয়া হয়ে গেছে। তিনি হাত ধুতে ধতে বললেন, 'আমি যেতাম। পাখি দেখার জন্যেই এসেছি। কিন্তু এখন যদি যাই—আমাকে একা যেতে হবে। নবনীর মাকে সঙ্গে নেয়া যাবে না। এই ভাবে যাওয়া যায় না।
শাহেদ বলল, 'আমরা উনাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করব।'
'পারবে না। পৃথিবীর সব কাজ পারবে। এই কাজটা পারবে না। আমার অ্যাডভাইস হচ্ছে—চেষ্টা করতেও যেও না। তার মেজাজ এখন আকাশে উঠে আছে। চেষ্টা করতে যাবে, সে একটা বিশ্রী কাণ্ড করবে। আমি চাই না এখন একটা বিশ্রী কাণ্ড হোক। নবনী!

'জ্বি বাবা।'
'তোর মাকে কিছু খাওয়াতে পারিস কিনা দেখ। সে দুপুরেও কিছু খায় নি।

.

জাহানারার ঘরের দরজা বন্ধ। তিনি দরজা খুললেন না। ভেতর থেকে মিলু বলল, 'আফা, আপনেরে চইল্যা যাইতে বলছে।' নবনী বলল, 'ঠাণ্ডা পানি এনেছি মা। দরজা খোল। পানিটা রেখে যাই।' জাহানারা কঠিন গলায় বললেন, 'পানি লাগবে না। তুই ঘুমাতে যা।'

.

নবনী ঘুমাতে এল অনেক রাতে। বারটা পার করে। শ্রাবণী জেগে আছে। গভীর মনোযোগে বই পড়ছে। গল্পের বই না, পাঠ্যবই। সব গল্পের বই সুটকেসে ঢুকিয়ে তালা দিয়ে দেয়া হয়েছে। এখন শুরু হয়েছে পাঠ্যবইয়ের পালা। নবনী বলল, 'এখনো জেগে আছিস! তোর না গলাব্যথা?'

বই

শ্রাবণী বলল, 'শুধু গলাব্যথা না আপা। জ্বর এসেছে। কপালে হাত দিয়ে দেখ।'

নবনী কপালে হাত দিল। আসলেই জ্বর। বেশ জ্বর। নবনী বলল, 'তুই এই জ্বর নিয়ে দিব্যি পড়াশোনা করে যাচ্ছিস?'

'হুঁ। আমি কোনো কিছুকেই পাত্তা দেই না। তাছাড়া আমার হচ্ছে ভালুক জ্বর। এই আছে এই নেই। তোমার সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করে যখন বিছানায় শুতে যাব তখন দেখবে জ্বর নেই।'

'তুই কি কিছু খাবি? খিদে লেগেছে?'

'না। তেঁতুলের আচার খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। সেটা তো এখানে পাওয়া যাবে না। কাল চেয়ারম্যান চাচাকে বলব।'

নবনী খাটে বসতে বসতে বলল, 'তুই খুব সুখে আছিস।'

শ্রাবণী বলল, 'হ্যাঁ সুখে আছি। আমাকে কেউ অসুখী করতে পারবে না। আমাকে অসুখী করা খুব কঠিন। তুমি আমার মতো না। তোমাকে এক সেকেন্ডে অসুখী করা যায়।'

'চুপ কর তো। আয়, ঘুমাতে আয়।'

শ্রাবণী বাতি নিভিয়ে ঘুমাতে গেল। বোনকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'আজ আমরা খানিকক্ষণ গল্প করব। কেমন আপা?'

'আচ্ছা। গল্প কর, আমি শুনি।'

'শাহেদ ভাই আসায় ভালোই হয়েছে। তোমার সঙ্গে আমি খানিকক্ষণ গল্প করার সুযোগ পাচ্ছি।'

'এমনিতে বুঝি আমার সঙ্গে গল্প করার সুযোগ পাস না?'

'উঁহু, পাই না। রাতে পাশাপাশি শুয়ে গল্প করার অন্যরকম আনন্দ। আচ্ছা আপা, আজ নাকি তুমি ঐ মাস্টার সাহেবের খোঁজে গিয়েছিলে?'

'কে বলল?'

'আমি অনুমান করছি। চেয়ারম্যান চাচা বললেন, তুমি বটগাছের কাছে গিয়েছিলে। সেখান থেকে ধারণা করলাম, তুমি নিশ্চয়ই ইংরেজির অধ্যাপকের সন্ধানে গিয়েছ।'

'আমি গাছটাই দেখতে গিয়েছিলাম—কারো সন্ধানে যাই নি।

'রেগে যাচ্ছ কেন, আপা? সাধারণ কথা বলছি—তুমি রেগে যাচ্ছ। ঐ ভদ্রলোক সম্পর্কে তোমার এক ধরনের কৌতূহল আছে বলেই আবারো তুমি বটগাছটার কাছে গিয়েছ। তুমি মনে মনে আশা করছিলে যে বটগাছের কাছে ঐ ভদ্রলোকের দেখা পেয়ে যাবে।'

'আমি এমন কিছুই ভাবি নি। তুই কি মনের ডাক্তার হয়ে গেছিস?'

শ্রাবণী হালকা গলায় বলল, 'আমাদের সমস্যা কি জান আপা? আমরা বেশিরভাগ সময়ই জানি না আমরা কী চাই। যেটা চাই বলে মনে হয় আসলে সেটা চাই না। তুমি তীব্রভাবে শাহেদ ভাইয়ের সঙ্গ কামনা করছ। এটা এক ধরনের ভ্রান্তিও হতে পারে। হয়তো তুমি অন্য কিছু চাচ্ছ—বুঝতে পারছ না।'

নবনী বিরক্ত হয়ে বলল, ‘এইসব কথা তুই কোন উপন্যাস থেকে বলছিস?’
শ্রাবণী খিলখিল করে হেসে ফেলল। নবনী বলল, ‘হাসি বন্ধ কর। রাগে গা জ্বলে যাচ্ছে।’
শ্রাবণী আরো শব্দ করে হেসে উঠল। অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে বলল, ‘তোমার রাগ আমি আরো বাড়িয়ে দিচ্ছি। এই যে শাহেদ ভাইয়ের কথাই ধর। শিক্ষিত, বুদ্ধিমান, কৃতী এবং সুপুরুষ একজন মানুষ। নিজের উপর তাঁর প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস। তাঁর ধারণা, নিজেকে তিনি ভালো করেই জানেন। আসলে কিন্তু জানেন না।’
‘তার মানে কি?’
‘আমার ধারণা—তোমার চেয়ে আমি—আমি শ্রাবণী চৌধুরী তাঁর কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। চট করে রেগে যেও না আপা—প্রমাণ দিচ্ছি। আমি এই শীতের মধ্যে তাকে কুয়োর পানিতে গোসল করতে বললাম, তিনি যথারীতি গোসল করে ঠাণ্ডা বাধালেন। আমি বললাম, শাহেদ ভাই কুয়োতলায় চা খেতে খুব ভালো লাগে। উনি রেগুলার সেখানে চা খাওয়া শুরু করলেন। বিকেলে আমরা ব্যাডমিন্টন খেলছিলাম। তুমি চুপচাপ একা বসে ছিলে। তিনি তোমাকে ফেলে আমার সঙ্গে ব্যাডমিন্টন খেলতেই আনন্দ পাচ্ছিলেন। খেলাটা তাঁর কাছে জরুরি ছিল না। আমার সঙ্গটা অনেক জরুরি ছিল। এই যে তিনি সব কাজকর্ম ফেলে এখানে ছুটে এলেন তার পেছনে তোমার যতটা ভূমিকা, আমার ধারণা—আমার নিজের ভূমিকা অনেক বেশি।’
নবনী বলল, ‘তোর জ্বর অনেক বেড়েছে। তুই অসুস্থ মেয়ের মতো কথা বলছিস। এসব সুস্থ কোনো মেয়ের কথা না। এসব হল বিকারগ্রস্ত মেয়ের কথা। সমস্যা শাহেদের না, সমস্যা তোর।’
শ্রাবণী হাই তুলতে তুলতে বলল, ‘আমার কোনোই সমস্যা নেই, আপা। আমার সমস্যা থাকলে এত সহজে এইসব কথা তোমাকে বলতে পারতাম না। সমস্যা কোথায় আমি তোমাকে ধরিয়ে দিলাম। আমি যা বলছি তা যে জ্বরের ঘোরে অসুস্থ হয়ে বলছি তাও কিন্তু না। আমি যা বলেছি তা প্রমাণ করে দিতে পারব।’
‘কীভাবে?’
কাল আমাদের তিনজনের পাখি শিকারে যাবার কথা। শেষ মুহূর্তে আমি বলব, ‘যাব না। তখন দেখবে শাহেদ ভাই বলবেন, থাক, বাদ দাও। যাওয়া বাতিল হয়ে যাবে।
নবনী ক্ষীণ স্বরে বলল, ‘তুই এমন সব অদ্ভুত কথা বলছিস কেন রে শ্রাবণী? তোর কী হয়েছে?’
‘আমার কিছুই হয় নি, আপা। যা সত্যি আমি তাই বলছি।’
‘যা সত্যি তা তুই বলছিস না। দিনরাত গল্পের বই পড়ে পড়ে তোর মাথা অন্য রকম হয়ে গেছে। তুই বানিয়ে বানিয়ে প্রচুর মিথ্যা কথা বলছিস। এখানে কোনো ইংরেজ মহিলার কবর নেই। তুই আমাকে বললি, কবর আছে—আমি খোঁজ নিলাম ....
বই
নবনী থেমে গেল। আর কথা বলা অর্থহীন। শ্রাবণী ঘুমিয়ে পড়েছে।

৮

নবনী খুব ভোরে ঘর থেকে বের হল। শ্রাবণী তখনো ঘুমাচ্ছে। কোলবালিশ জড়িয়ে এলোমেলো হয়ে শুয়ে আছে। তার শোয়া দেখে মনে হবে বাচ্চা একটা মেয়ে। প্রচণ্ড শীতেও গায়ে কখনো লেপ থাকে না। ভোরবেলার দিকে খুব শীত পড়ে। আজো পড়েছে। শ্রাবণীর গায়ে লেপ নেই। কোলবালিশ জড়িয়ে সে শীতে কাঁপছে। ঘর থেকে বের হবার সময় নবনী ছোট বোনের গায়ে লেপ তুলে দিল। কেমন বাচ্চাদের মতো ঘুমিয়ে থাকে। বড় মায়া লাগে!

নবনীর নিজেরও শীত লাগছে। শাড়িটা ভালোমতো গায়ে জড়িয়ে সে ডাকবাংলোর মূল বারান্দায় চলে এল। শাহেদ বারান্দায় বসে আছে। এত ভোরে সে কখনো ওঠে না। শাহেদ নবনীকে দেখে খুশি খুশি গলায় বলল, 'গুড মর্নিং প্রিন্সেস'। নবনী বলল, 'গুড মর্নিং।'

শাহেদ বলল, 'আজ কেন জানি ভোর পাঁচটার সময় ঘুম ভেঙে গেছে। তারপর হাজার চেষ্টা করেও ঘুম আসে না। শেষমেষ বারান্দায় এসে বসে আছি। কী প্রচণ্ড কুয়াশা হয়েছে দেখছ?'

'হ্যাঁ, খুব কুয়াশা।'

'আজ তো আবার স্পিডবোটে করে বেড়াতে যাবার কথা। কুয়াশা না কাটলে যাব কীভাবে? রওনা হতে অনেক দেরি হবে।'

নবনী কিছু বলল না। শাহেদ বলল, 'তোমার ঘুম ভেঙেছে, ভালো হয়েছে। চল কুয়াশার মধ্যে হেঁটে আসি। মর্নিং ওয়াক। তার আগে আমাকে চা খেতে হবে। নবনী, চা বানাতে পারবে?'

'পারব না কেন?'

'তাহলে দয়া করে চা বানিয়ে নিয়ে এস। আমি কুয়োতলায় যাচ্ছি। কুয়োতলা বেশ একটা ইন্টারেস্টিং জায়গা। শ্রাবণীর কথা প্রথম বিশ্বাস করি নি। এখন দেখি কুয়োতলায় বসে চা খেতে অন্যরকম লাগে।!'

'তুমি যাও কুয়োতলায়, আমি চা নিয়ে আসছি।'

নবনী রান্নাঘরে ঢুকে দেখে জাহানারা ইতিমধ্যেই চুলায় কেতলি বসিয়ে ময়দা মাখছেন। লুচি তৈরি হবে। জাহানারা বললেন, 'তোকে এমন দেখাচ্ছে কেন রে নবু?'

'কেমন দেখাচ্ছে?'

'মনে হচ্ছে শরীর খুব খারাপ। রাতে ঘুম হয় নি?'

'হয়েছে।'

'জ্বর-টর আসে নি তো নবু?'

'উহুঁ।'

'দেখি কাছে আয়, গায়ে হাত দিয়ে দেখি।'

'তুমি তো ময়দা মাখছ। গায়ে হাত দেবে কী করে?'

জাহানারা বললেন, 'তুই আমার গালের সঙ্গে তোর গাল লাগা। তাতেই বুঝব।'

নবনী এসে মাকে জড়িয়ে ধরল। জাহানারা নবনীর মুখ দেখতে পেলেন না। তিনি বুঝতে পারছেন নবনী কেঁপে কেঁপে উঠছে। তাঁর বুকে একটা ধাক্কা লাগল।

'নবু, মা, কী হয়েছে তোর?'

'কেন জানি মা কিচ্ছু ভালো লাগছে না।'

'ভালো না লাগার মতো কিছু কি হয়েছে?'

'না।'

'তুই তো মাঝে মাঝে অকারণেই শাহেদের সঙ্গে ঝগড়া করিস। ঝগড়া হয় নি তো?'

'না, ঝগড়া হয় নি। দুকাপ চা বানাও তো মা।'

'তুই বানিয়ে নিয়ে যা। আমার হাত বন্ধ। শাহেদের কাপে চিনি আধ চামচ বেশি দিবি। ও চিনি বেশি খায়। ঐ তাকের উপর টি-ব্যাগ আছে।'

নবনী চা বানাচ্ছে। জাহানারা ময়দা মাখা বন্ধ করে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। তিনি অবশ্যি প্রায়ই মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। যত দিন যাচ্ছে, মেয়েটা ততই সুন্দর হচ্ছে। এত সুন্দর যে মাঝে মাঝে মেয়েটাকে তাঁর রক্ত-মাংসের

মানুষ বলেই মনে হয় না।
নবনী বলল, 'মা, তোমার জন্যে এক কাপ চা বানাব?'
'না।
'না কেন? খাও না মা। মেয়ের হাতে বানানো চা খাওয়া যায়। এস, আমরা দুজনে বসে চা খাই।'
'আচ্ছা ঠিক আছে।'
নবনী শাহেদের চায়ের কাপ হাতে উঠে গেল। খাবার ঘরে গিয়ে ডাকল, 'মিলু বুয়া'! মিলু দৌড়ে এল। নবনী খানিকটা অস্বস্তির সঙ্গে বলল, 'এই চা-টা তোমার শাহেদ ভাইকে একটু দিয়ে আস তো। কুয়োতলায় আছে। পিরিচ দিয়ে ঢেকে নিয়ে যাও।'
মিলু চায়ের কাপ হাতে নিতে নিতে বলল, 'আম্মার শইল রাইতে খুব খারাপ গেছে।'
'কী হয়েছে?'
'মাথাত নাকি খুব যন্ত্রণা হইছে। বারিন্দার এই মাথায় ঐ মাথায় হাঁটছেন।'
'ডাকলে না কেন আমাকে?'
'ডাকতে চাইছিলাম। আম্মা নিষেধ করল।'
'তুমি চা নিয়ে যাও, মিলু বুয়া। ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

.

জাহানারা মেয়ের সঙ্গে বসে চা খাচ্ছেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে না রাতে তাঁর শরীর খারাপ করেছিল। তবে তাঁকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে। নবনী বলল, 'গত রাতে তোমার একেবারেই ঘুম হয় নি, তাই না?'
'হয়েছে কিছু। চেয়ারে বসে বসে ঘুমিয়েছি।'
'মিলু বুয়া বলছিল খুব নাকি মাথার যন্ত্রণা হচ্ছিল?'
'মাথার যন্ত্রণা তো সব সময়ই হয়। সেটা কিছু না।'
'আমার মনে হয় ভালোমতো ডাক্তার দেখানো উচিত। নয়তো পরে হঠাৎ ধরা পড়বে মাথায় টিউমার হয়েছে। আমরা আগে কিছু বুঝতে পারি নি। এবার ঢাকা গিয়ে তুমি খুব ভালো করে চিকিৎসা করাবে।'
'আচ্ছা করাব।'
'কথা দিচ্ছ কিন্তু মা।'
'আচ্ছা।'
নবনী চা শেষ করে বাবার খোঁজে গেল। জামিল সাহেব এমনিতে খুব ভোরে ওঠেন। ফজরের নামায পড়েন। এখানে এসে নিয়মের ব্যতিক্রম হচ্ছে। তিনি ভোরে উঠতে পারছেন না। আজ তাঁরও ব্যতিক্রম হয়েছে। তিনি ফজর ওয়াক্তে উঠে নামায পড়েছেন এখন আবার ঘুম পাচ্ছে। ঘুমিয়ে পড়বেন কিনা ভাবছেন। নবনীকে ঢুকতে দেখে তিনি আনন্দিত গলায় বললেন, 'আমার বড় মেয়ে কেমন আছেন গো?'
'ভালো আছি, বাবা।'
'ছুটি কেমন লাগছে?'
'খুব ভালো লাগছে।'
'আজ তোদের প্রোগ্রাম কি?'
'স্পিডবোটে করে পাখি দেখতে যাব।'
'যা কুশায়া পড়েছে! রওনা হতে হতে বেলা হয়ে যাবে। আসল দৃশ্য কিছু দেখতে পাবি না।'
'নকলটাই দেখব, বাবা। আসল দৃশ্যের চেয়ে নকল দৃশ্য সব সময় অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং হয়।'
জামিল সাহেব হো-হো করে হাসলেন। মনে মনে বললেন, বাহ্, মেয়েটা তো খুব সুন্দর করে কথা বলল। মেয়ে দুটার সঙ্গে কথা বলাই হয় না। দিনের বেশিরভাগ সময় কাটে মিটিং-এ। বাকি সময়টা আজেবাজে লোকদের তদবির শুনে। সিনিয়রকে ডুবিয়ে জুনিয়র প্রমোশন

পেয়েছে, সেই তদবির। ঢাকা থেকে কুষ্টিয়ায় বদলি করে দিয়েছে, বদলি ফেরানোর তদবির। একজন এসেছিল ওয়াসার পানির লাইন কেটে দিয়েছে- লাইন বসানোর তদবিরে। সামান্য পানির লাইন বসানোয় মন্ত্রীর তদবির লাগে। ঘাড় ধরে লোকটাকে বের করে দেবার ইচ্ছা হয়েছিল। তা করেন নি বরং হাসিমুখে তার সমস্যা শুনেছেন, এবং সেক্রেটারিকে বলেছেন ওয়াসার একজিকিউটিভ ইনজিনিয়ারকে বলে দিতে। মন্ত্রী পর্যন্ত যারা পৌঁছতে পারে তারা ক্ষমতাবান মানুষ। এদের অগ্রাহ্য করতে নেই।'
তিনি কাউকে অগ্রাহ্য করেন না। সবার সমস্যাই শোনেন। শুধু নিজের মেয়েদের কোনো কথা শোনার সময় পান না। ছুটির সাত দিন পুরোপুরি মেয়েদের সঙ্গে কাটাবেন ভেবেছিলেন—তাও হচ্ছে না।
'নবনী মা, বোস তো আমার পাশে।'
নবনী বসল। জামিল সাহেব বললেন, 'মার মুখটা এমন মলিন কেন? কী হয়েছে আমার মার?'
'আমার কিছু হয় নি, বাবা। সম্ভবত মার কিছু হয়েছে। রাতে ঘুমাচ্ছে না।'
'এটা তো নরম্যাল। সে রাতে কখনো ঘুমায় না। আমার ধারণা, ঘুম এলেও জেগে থাকে।'
'এরকম করতে করতে দেখবে একদিন খুব অসুস্থ হয়ে পড়বে।'
'তা তো পড়বেই। কিন্তু তোর মাকে কে বোঝাবে? আমার সাধ্যের বাইরে। আমি চেষ্টা কম করি নি।'
'অনেক চেষ্টা করেছি। এখন হাত ধুয়ে ফেলেছি। তোরা চেষ্টা করে দেখ কিছু করতে পারিস কিনা। মনে হয় না পারবি। তোর মার কথা বাদ দে। তোদের কথা বল। ছুটি কেমন লাগছে?'
'একবার তো বলেছি বাবা—ভালো লাগছে।'
'এখানে যা দেখার দেখেছিস?'
'হুঁ।'
'মনু মিয়ার দিঘি দেখেছিস।'
'না। সেটা আবার কোথায়?'
'সুরুজ মিয়াকে বললেই নিয়ে যাবে। নৌকায় যেতে হবে। এখান থেকে তিন-চার মাইল হবে।'
'বিরাট দিঘি?'
'মোটামুটি বিরাটই আছে। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হল পানি লাল। গাঢ় লাল। ভয়ে কেউ দিঘিতে নামে না। অদ্ভুত মিথ আছে দিঘি নিয়ে। সুরুজ মিয়া জানে নিশ্চয়ই।'
'পানি লাল কেন, বাবা?'
'ঠিক জানি না। কে যেন বলেছিল লাল শৈবালের কারণে পানি হয়েছে লাল। এসব তোদের সায়েন্সের ব্যাপার। তোরাই তো ভালো জানবি।'
'আমি আমার পাঠ্যবইয়ের বাইরে কিছু জানি না, বাবা। শ্রাবণী হয়তো জানে। তার কাজই বই পড়া।'
বই

.
কুয়াশা কেটেছে।
স্পিডবোট চলে এসেছে। রওনা হতে দেরি হবে। সুরুজ মিয়া ছাতা আনতে গেছেন। রোদ চড়লে ছাতা না থাকলে কষ্ট হবে। শ্রাবণী বাইরে যাবার জন্যে তৈরি হয়েছে। আজ এই প্রথম সে শাড়ি পরল। নবনীকে বলল, 'তোমার মুক্তার কানের দুলজোড়া আমাকে দাও তো আপা।'
নবনী দুল পরিয়ে দিল। শাহেদ বলল, 'শ্রাবণীকে তো আজ অদ্ভুত লাগছে! নবনী দেখেছ, কী অপূর্ব লাগছে শ্রাবণীকে?'
নবনী বলল, 'হ্যাঁ অপূর্ব লাগছে।'
শাহেদ বলল, শাড়ি হচ্ছে অসম্ভব সুন্দর একটা পোশাক। শোন শ্রাবণী, এখন থেকে তুমি সব সময় শাড়ি পরবে।'

শ্রাবণী বলল, ‘আচ্ছা শাহেদ ভাই, আপনাকে একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করছি। বলুন তো দেখি আমি, আপনি এবং একটি শাড়ি। এি তিন জিনিসের মধ্যে একটা সুন্দর মিল আছে। মিলটা কোথায়?’
শাহেদ অবাক হয়ে বলল, ‘আমি তো মিল পাচ্ছি না।’
‘না ভাবলে পাবেন কী করে? ভেবে তারপর বলুন। আপা, তুমি বলতে পারবে?’
‘না, আমি বলতে পারব না।’
শ্রাবণী হাসতে হাসতে বলল, ‘মিলটা হল তিনটিরই শুরুর অক্ষর হচ্ছে ‘শ’।’ শ্রাবণী, শাহেদ এবং শাড়ি।
নবনী ছোটবোনের দিকে তাকিয়ে আছে। সে কিছু একটা বলতে গিয়েও বলল না। নিজেকে সামলে নিল।
শ্রাবণী বলল, ‘আপা, তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। এস আমার সঙ্গে।’
‘কোথায় যাব?’
‘খানিকটা দূরে যেতে হবে। মিনিট দশেক হাঁটতে হবে।’
‘ডাকবাংলোর ভেতরে বলা যাবে না?’
‘না।’
শাহেদ বলল, ‘আমি কি তোমাদের সাথে আসতে পারি?’
‘না। বোনে বোনে কথা হবে, এখানে আপনার কোনো স্থান নেই।’
‘আমি সঙ্গে আসি। তোমাদের কথা বলার সময় না হয় দূরে সরে যাব।’
‘অসম্ভব। আপনাকে নেয়াই যাবে না।’

.

নবনী এবং শ্রাবণী হাঁটছে। কেউ কোনো কথা বলছে না। জংলামতো একটা জায়গায় এসে শ্রাবণী থমকে দাঁড়াল। আপার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘এখন এই বনের ভেতরে ঢুকতে হবে।’
নবনী বলল, ‘কথাগুলি কি বনের ভেতর ঢুকে বলবি?’
‘কথা না। তোমাকে একটা জিনিস দেখাব।’
‘কী জিনিস?’
‘মারিয়া স্টোনের কবর। তুমি আমাকে অবিশ্বাস করেছিলে। তুমি ভেবেছিলে আমি মিথ্যা কথা বলছি। আমি সত্যি কথাই বলি, আপা। কিছু কিছু মানুষ আছে যাদের সত্যি কথা মিথ্যার মতো মনে হয়। আমি সে রকম একজন। এস বনে ঢুকি, বেশিদূর যেতে হবে না। অল্প কিছুদূর গেলেই দেখবে।
নবনী ক্লান্ত গলায় বলল, ‘আমি তোর কথা বিশ্বাস করছি। আমি দেখতে চাচ্ছি না।’
তোমাকে দেখতে হবে। এতদূর এসে তুমি না দেখে যেতে পারবে না।
‘তুই কেন আমার সঙ্গে এরকম করছিস?’
‘তুমি আমাকে মিথ্যাবাদী ভাববে, তা হবে না।’
‘আমি তোকে মিথ্যাবাদী ভাবছি না।’
‘এক সময় ভেবেছিলে।
‘হ্যাঁ, এক সময় ভেবেছিলাম। I am sorry for that.’
‘এস আপা, দুমিনিটের মাত্র পথ। চোরকাঁটা আছে। শাড়ি খানিকটা উপরে তুলতে হবে। ভয় নেই, কেউ দেখবে না।’
তারা কবরের কাছে এসে দাঁড়াল। একটা কালো পাথরের ক্রসচিহ্ন। পেছনে কালো পাথরে খোদাই করে লেখা, মারিয়া স্টোন। দীর্ঘ ইংরেজি কবিতা। এপিটাপ। প্রথম দু লাইন—
The bells will ring,
The birds will sing.
শ্রাবণী বলল, ‘আপা দেখলে?’
‘হ্যাঁ দেখলাম।’

‘শাহেদ ভাই সম্পর্কে যে কথাগুলো বলেছি সেগুলিও যে সত্যি তা কি তুমি বিশ্বাস করছ?’
নবনী জবাব দিল না। শ্রাবণী বলল, ‘পাখি দেখতে যাবার জন্যে আমরা সব তৈরি হয়ে আছি। এখন আমি যদি বলি শাহেদ ভাই, আপনি আপাকে নিয়ে যান। আমার মচকানো পা আবার ব্যথা করছে। আমি যেতে পারব না। তাহলে শাহেদ ভাই যাবে না। সে থেকে যাবে। আমি কি প্রমাণ করব?’
‘না।
‘যা সত্যি তা স্বীকার করে নেয়াই কি ভালো না? আমি জানি এখন তোমার কষ্ট হচ্ছে। এটা কিন্তু অনেক ভালো। কষ্টটা বিয়ের পর হবার চেয়ে আগে হওয়াই ভালো।’
‘তুই চুপ কর্।’
তারা নিঃশব্দে ডাকবাংলোয় ফিরে এল। ডাকবাংলোর গেটের কাছে শাহেদ দাঁড়িয়ে আছে। তার মাথায় ক্রিকেট খেলোয়াড়দের মতো সাদা টুপি। তাকে সুন্দর দেখাচ্ছে। শাহেদ চেঁচিয়ে বলর, ‘তোমরা এত দেরি করেছ? যাত্রার সব আয়োজন সম্পন্ন। ডাকবাংলোয় ঢোকার দরকার নেই—তোমরা এখান থেকে সরাসরি স্পিডবোটে উঠবে। তোমাদের ব্যাগ-ট্যাগ সব তোলা হয়েছে। পানির বোতল নেয়া হয়েছে। ফ্লাস্ক ভর্তি চা নেয়া হয়েছে।’
শ্রাবণী বলল, একটা ক্ষুদ্র সমস্যা হয়েছে, শাহেদ ভাই।’
‘কী ক্ষুদ্র সমস্যা।’
‘হাঁটতে গিয়ে আমার মচকে যাওয়া পা গর্তে পড়েছে। আমার মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই যে ব্যথায় আমি ছটফট করছি। কাজেই আমি যেতে পারছি না। আমাকে গরম পানিতে পা ডুবিয়ে বসে থাকতে হবে।’
শাহেদ হতভম্ব গলায় বলল, ‘সে কী?’
‘তাতে আপনাদের প্রোগ্রামের কোনো রকম হেরফের হবে না। আপনি আপাকে নিয়ে যাবেন। হৈচৈ করে আসবেন।’
নবনী এক দৃষ্টিতে বোনের দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখে পলক পর্যন্ত পড়ছে না। শাহেদ বলল, ‘তিনজন মিলে যাব ঠিক করেছি, এখন দুজন যাব, তা কি করে হয়! তাছাড়া পাখি শিকারে তোমার আগ্রহই সবচে’ বেশি ছিল।’
‘আগ্রহ এখনো আছে। সুন্দর সুন্দর পাখি গুলি করে মেরে ফেলার দৃশ্য খুব ইন্টারিস্টেং হবার কথা কিন্তু উপায় নেই। পায়ে দারুণ ব্যথা।’
শাহেদ বলল, ‘তাহলে প্রোগ্রাম বাদ দেয়া যাক। তোমার পায়ের ব্যথা কমুক, তারপর যাব। আজই যেতে হবে এমন তো কথা নেই। নবনী, তুমি কী বল?’
নবনী সহজ গলায় বলল, শ্রাবণীর পায়ের ব্যথা-ট্যথা কিছুই নেই। ও ভালোই আছে। ও যাবে পাখি দেখতে। ও তোমার সঙ্গে তামাশা করছে। আমি যেতে পারব না। আমার পাখি শিকার ভালো লাগে না। তাছাড়া মার শরীর খুব খারাপ। আমি মার সঙ্গে থাকব। একজন ডাক্তার এনে মাকে দেখাব।’
শাহেদ বলল, ‘তুমি কি সত্যি যাবে না?’
‘না। তাতে অসুবিধা নেই। তুমি শ্রাবণীকে নিয়ে ঘুরে এস। এঁরা কষ্ট করে এত আয়োজন করেছেন। এখন না যাওয়া ঠিক হবে না।’
শাহেদ বলল, ‘সেটাও সত্যি।’
নবনী বলল, ‘দেরি না করে তোমরা রওনা হয়ে যাও।’
নবনী ডাকবাংলোয় ঢুকে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্পিডবোট চালু করার ভট্ ভট্ শব্দ কানে এল।

৯

নবনী নিজের ঘরে শুয়ে আছে। ভুল বলা হল। নিজের ঘর না, শ্রাবণীর ঘর। এই মুহূর্তে ডাকবাংলোয় তার নিজের কোনো ঘর নেই। নবনীর ইচ্ছা করছে, শ্রাবণীর মতো কোলবালিশ জড়িয়ে নিশ্চিত মনে খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে থাকে। খুব ক্লান্ত লাগছে। মন ক্লান্ত হলেও শরীরও বোধহয় ক্লান্ত হয়ে যায়। ঘরটায় প্রচুর আলো। জানালার পর্দা সরিয়ে দেয়া, ঘরে রোদ ঢুকছে। চোখে আলো লাগছে। চারদিক অন্ধকার করে শুয়ে থাকলে বোধহয় ভালো লাগত। বিছানা থেকে উঠে পর্দা টেনে দিতেও ইচ্ছা করছে না। আলসী লাগছে।

আস্তে করে কে যেন দরজায় হাত রাখল। নবনী বলল, 'কে? জামিল সাহেব বললেন, 'আমি।'

'এস বাবা।

জামিল সাহেব এসে ঢুকলেন। তাঁর মুখও বিষণ্ন। তিনি বললেন, 'হঠাৎ তোর আবার কী হল?'

নবনী বিছানায় উঠে বসতে বসতে বলল, 'বুঝতে পারছি না। খুব ক্লান্ত লাগছে। খুব ঘুম পাচ্ছে। মনে হচ্ছে অনেকদিন আরাম করে ঘুমাচ্ছি না।'

'বেড়াতে এসে সবাই একসঙ্গে অসুখ বাধিয়ে ফেলা তো কোনো কাজের কথা না। যাই হোক, আমি শামসুদ্দিনকে খবর দিয়েছি...'

'শামসুদ্দিন কে?'

'ডাক্তার। এমবিবিএস। শুনেছি ভালো ডাক্তার।'

নবনী বলল, 'বাবা, চল আমরা ঢাকায় চলে যাই। এখানে আর ভালো লাগছে না।'

জামিল সাহেব বললেন, 'সেটাই ভালো। আমিও একটু আগে তাই ভাবছিলাম। এখানে হঠাৎ বড় ধরনের কোনো অসুখ-বিসুখ হলে মুশকিলে পড়ে যাব। নবনী, তুই শুয়ে না থেকে বরং উঠে বস। শুয়ে থাকলে অসুখকে প্রশ্রয় দেয়া হয়।'

নবনী উঠে বসল। জামিল সাহেব বললেন, 'তুই তোর পরীক্ষার রেজাল্ট নিয়ে চিন্তিত না তো?'

'না।'

'আমার মনে হয় পরীক্ষার রেজাল্টের চিন্তাই তোকে আপসেট করে রাখছে। এত চিন্তা করতে নেই- যা হবার হবে। আমার ধারণা, ভালোই হবে।'

নবনী হাসতে হাসতে বলল, 'পরীক্ষা ভালোই হবে। আমি পরীক্ষার সব প্রশ্নের জবাব জানি। অন্য কোনো প্রশ্নের জবাব জানি না।'

'এর মানে কি?'

'কোনো মানে নেই, বাবা। কথার কথা বললাম।'

জামিল সাহেব সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, 'ছুটি কাটানোর ব্যাপারে আমরা এখনো অভ্যস্ত হয়ে উঠিনি। ছুটি ব্যাপারটা কালচারে নেই। আমাদের ছুটি মানে মামার বাড়িতে গিয়ে কিছুদিন থেকে আসা। তার ফল এই হয়েছে যে সত্যিকার অর্থে ছুটি কাটানো বিষয়টা আমরা জানি না। বাইরে বেড়াতে এলে হাজারো সমস্যায় হাবুডুবু খাই। একজন রাতে ঘুমায় না। একজনের বিষণ্নতা রোগ হয়। দরজা বন্ধ করে শুয়ে থাকে।'

নবনী বলল, 'তুমি কি আমার উপর রাগ করছ, বাবা?'

'না, রাগ করছি না। তুই যেমন কথার কথা বললি, আমিও কথার কথা বললাম।'

জামিল সাহেব উঠে পড়লেন। নবনী বলল, 'বাবা, তুমি কি যাবার আগে জানালার পর্দাটা টেনে দিয়ে যেতে পারবে?'

'পারব।'

জামিল সাহেব জানালার পর্দা টেনে দিলেন। দরজা ভিজিয়ে দিয়ে গেলেন। ঘর অবশ্যি পুরোপুরি অন্ধকার হল না। এই ভালো। ঘুমানোর জন্যে অন্ধকার ভালো। চুপচাপ শুয়ে থাকার জন্যে দরকার আধো আলো আধো অন্ধকার।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, শাহেদের সঙ্গে তার পরিচয়— এরকম আধো আলো এবং আধো

অন্ধকারে। তারা তখন থাকত শ্যামলী। জামিল সাহেব মন্ত্রী হন নি। তবুও বেশ ক্ষমতাবান মানুষ। বাড়িতে দারোয়ান আছে, মালী আছে, কুকুর আছে। একদিন বর্ষাকালে ভর সন্ধ্যাবেলায় নবনী শুয়ে আছে— তার মাথা ধরেছে। মিলু বুয়া এসে বলল, 'একজন লোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসছে।'

নবনী বিস্মিত হয়ে বলল, 'আমাদের ক্লাসের কোনো ছাত্র?'

'জিজ্ঞেস করি নাই।'

'জিজ্ঞেস করে এস। আর ছাত্র যদি না হয় তাহলে জিজ্ঞেস কর আমার কাছে কী চায়?'

মিলু বুয়া ফিরে এসে জানাল—'ছাত্র না। ভদ্রলোক একটা জরুরি কাজে এসেছেন নবনী বিরক্ত হয়ে বলল, 'আমার সঙ্গে কারোরই কোনো জরুরি কাজ নেই—চলে যেতে বল।'

মিলু বলল, 'আপনে নিচে গেলে ভালো হয় আফা—সাথে অতবড় একটা ছবি নিয়া আসছে।'

নবনী নিচে নামল। বসার ঘরে ঢুকে প্রথমে যে জিনিসটা চোখে পড়ল, তা হল বিশাল একটা পেইনটিং। বর্ষার ছবি। আকাশে ঘন কালো মেঘ। খোলা প্রান্তরে কয়েকটা তাল গাছ। ছবিটা দেখেই মনে হচ্ছে—এই বুঝি বৃষ্টি নামল। ছবি থেকে চোখ ফেরানো কষ্ট। এত সুন্দর ছবি যে নিয়ে এসেছে সেই মানুষটা দাঁড়িয়ে আছে। সুন্দর চেহারা, ভদ্র একজন যুবক। মেরুন রঙের একটা হাফশার্ট, সাদা প্যান্ট। মানুষটা হাসছে খুব সুন্দর করে।

নবনী বলল, 'কী ব্যাপার?'

যুবক বলল, 'আমার নাম শাহেদ। ছবিটা কি আপনার পছন্দ হয়েছে?'

'খুব সুন্দর ছবি। ছবি নিয়ে এসেছেন কেন?'

'ছবি যদি আপনার পছন্দ হয় আপনি কিনতে পারেন। আমাকে ছবির সেলসম্যান বলতে পারেন।'

নবনী বিস্মিত হয়ে বলল, 'আপনি কি মানুষের বাড়ি বাড়ি ছবি বিক্রি করেন?'

'অনেকটা তাই।'

'এই ছবি আপনার আঁকা?'

'আমার এক বন্ধুর আঁকা। আমি ছবি আঁকতে পারি না। ভালো ছবি, মন্দ ছবিও বুঝি না।'

'দাম কত?'

'আমার বন্ধু দশ হাজার টাকা চাচ্ছে।'

'কী সর্বনাশ!'

'দশ হাজার টাকা শুনে কী সর্বনাশ বলা ঠিক হচ্ছে? এই টাকা তো আপনাদের কাছে কিছুই না।'

নবনী হেসে ফেলে বলল, 'আমার বাবার কাছে সম্ভবত কিছুই না। কিন্তু আমার কাছে অনেক টাকা। এই মুহূর্তে আমার কাছে দুশ টাকা আছে। যাই হোক, আপনি ছবি রেখে যান। আমি বাবাকে জিজ্ঞেস করব।'

'কবে খোঁজ নিতে আসব?'

'কাল আসুন।

'জ্বি আচ্ছা।

শ্রাবণী সব শুনেই বলেছে, 'আপা, ঐ ভদ্রলোক তোমার কাছে ছবি বিক্রি করতে আসেন নি। ছবি বিক্রি করতে এলে বাবার কাছেই আসতেন। তিনি তোমার কাছেই এসেছেন। মিলু বুয়াকে বলেছেন— এ বাড়ির বড় মেয়ে নবনীকে ডাক।' তিনি তোমার নাম জেনেই এসেছেন। আমার ধারণা, ভদ্রলোক তোমাকে কোথাও দেখেছেন, দেখার পরই তাঁর মাথা খারাপের মতো হয়েছে। সেটাই স্বাভাবিক। তিনি তোমার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে সুন্দর একটা অজুহাত বের করেছেন। দশ হাজার টাকা খরচ করে নিজেই ছবিটা কিনেছেন।'

নবনী বলল, 'তোর রিসেন্টলি পড়া কোনো উপন্যাসে কি এরকম কিছু আছে?'

'উঁহু নেই। তবে আমার অনুমান সত্যি। বাজি রাখতে চাও? পাঁচশ টাকা বাজি।'

'পাঁচশ না। দুশ টাকা বাজি। আমার কাছে দুশ টাকা আছে।'

‘বেশ দুশ টাকা।’
শ্রাবণী বাজি জিতে গেল। সব বাজিতেই সে জিতে যায়। বাজির ভাগ্য সবার ভালো থাকে না।

.

দরজায় টোকা পড়ছে। নবনী বলল, ‘কে?
মিলু বলল, ‘বড় আফা, আম্মা আপনেরে ডাকে।
নবনী দরজা খুলে বের হয়ে এল।
জাহানারা ভেতরের বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে আছেন। তাঁর মুখ শুকনো। চোখ লাল। তঁর মাথার চুল ভেজা। মাথা দপদপ করছিল। কিছুক্ষণ আগেই মাথায় পানি ঢেলেছেন। চুল শুকায় নি।
নবনী বলল, ‘ডেকেছ মা?’
জাহানারা বললেন, ‘তোর কী হয়েছে?’
নবনী বলল, ‘কিছু হয় নি তো।’
‘আমার কাছে লুকাবি না। বল্ কী হয়েছে?’
নবনী চুপ করে রইল। জাহানারা বললেন, ‘শ্রাবণী কেন এমন সেজেগুজে হাসতে হাসতে গেল, আর তুই কেন দরজা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে আছিস?’
নবনী মার দিকে তাকিয়ে রইল। জাহানারা ক্লান্ত গলায় ডাকলেন, ‘মিলু, মিলু!’
মিলু ছুটে এল। জাহানারা বললেন, ‘আমাকে মাথাধরার ওষুধ এনে দে। প্রচণ্ড মাথা ধরেছে।’
নবনী বলল, ‘মা, তুমি শুয়ে থাক। তোমাকে দেখেই মনে হচ্ছে তোমার খুব শরীর খারাপ।’
জাহানারা উঠে দাঁড়ালেন। তিনি ঠিকমতো পা ফেলতে পারছেন না। নবনী এসে জাহানারার হাত ধরল। জাহানারা বললেন, ‘তোকে আমি কিছু কথা বলব, তুই আয় আমার সঙ্গে।’

১০

স্পিডবোটের মেশিন বিকল হয়েছে।

স্টার্ট দিলে ভট্ ভট্ শব্দ ঠিকই হয়, প্রপেলার ঘোরে না। সুরুজ মিয়া বললেন, 'এ তো বড়ই যন্ত্রণা হল!' স্পিডবোটের চালক প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। তার গা বেয়ে ঘাম পড়ছে। কোনো কাজ হচ্ছে না। তারা মাঝনদীতে থেমে আছে। অল্প বাতাস আছে। নৌকা দুলছে। শ্রাবণী বলল, 'আমার তো এই অবস্থাটা ভালো লাগছে। ভট্ ভট্ শব্দে মাথা ধরে গিয়েছিল। চেয়ারম্যান চাচা!'

'জ্বি আম্মা।'

'আপনি এক কাজ করুন। আমাদের দুজনকে নামিয়ে দিন। আমরা চায়ের ফ্লাস্ক, খাবারদাবার নিয়ে এখানেই নেমে যাই। আপনারা দেখুন কিছু করতে পারেন কিনা। করতে না পারলেও ক্ষতি নেই। শাহেদ ভাই, স্পিডবোট চালু না হলে আপনার কোনো সমস্যা আছে?'

'কোনো সমস্যা নেই।'

সবুজ মিয়া বললেন, 'ফিরতে খুব সমস্যা হবে আম্মা। বেজায় সমস্যা— ফিরতে হবে উজানে।'

শাহেদ বলল, 'ফেরার সময় আসুক, তখন দেখা যাবে।'

তারা নেমে পড়ল। শ্রাবণী বলল, 'চলুন শাহেদ ভাই, আমরা কোনো একটা গাছের নিচে বসি। আপনার দায়িত্ব হচ্ছে সুন্দর একটা গাছ খুঁজে বের করা। আপনি ক্যামেরা এনেছেন না?'

'এনেছি।'

'তাহলে চুপচাপ বসে আছেন কেন? ছবি তুলুন। ইস, আমার দারুণ লাগছে।'

'তোমার পায়ের ব্যথা কি সেরে গেছে?'

'সারে নি, এখনো ব্যথা নিয়েই হাঁটছি। আর আপনি এমনই মানুষ যে একবার ভদ্রতা করেও বলেন নি—শ্রাবণী, আমার হাত ধরে ধরে হাঁট। নাকি আপনি চান না আমি আপনার হাত ধরি?'

শাহেদ বলল, কষ্ট করার কোনো দরকার নেই। আমার হাত ধর।'

'এটা বলতে গিয়ে আপনার গলা কিন্তু কেঁপে গেছে শাহেদ ভাই।'

'গলা কাঁপবে কেন?

শ্রাবণী খিলখিল করে হাসছে।

শাহেদ বলল, 'দেখি আমার হাত ধর তো।'

শ্রাবণী বলল, 'কেউ আবার কিছু মনে করবে না তো? আমাদের স্পিডবোটের চালককে দেখুন—কেমন ড্যাব ড্যাব করে তাকাচ্ছে।'

'তাতে কিচ্ছু যায় আসে না।'

শাহেদ বলল, 'তোমাকে এত খুশি লাগছে কেন?'

'জানি না কেন। জ্বর আছে বলেই হয়তো। গায়ে জ্বর থাকলে আমার খুব ফূর্তি লাগে।'

'তুমি অদ্ভুত মেয়ে।'

শ্রাবণী শাহেদের হাত ধরল। শাহেদ বলল, 'তোমার হাত এমন গরম কেন?'

'জ্বর এসেছে, এই জন্যে গরম। শাহেদ ভাই, আপনি কি জানেন যে আমার মধ্যে ভালুক-স্বভাব খুবই প্রবল।

'সেটা আবার কী?'

'ভালুকদের ঝপ করে জ্বর আসে। আবার ঝপ করে চলে যায়। আমার এখন জ্বর এসেছে। আবার চলেও যাবে।

তারা একটা শিমুল গাছের কাছে এসে দাঁড়াল। শ্রাবণী বলল, 'এই গাছটা আমার পছন্দ হয়েছে। আসুন, এই গাছের নিচে বসে চা খাওয়া যাক।'

শাহেদ বলল, 'গাছটা কাঁটায় ভর্তি।'

শ্রাবণী বলল, 'কাঁটা ভর্তি গাছই আমার ভালো লাগে। গোলাপ গাছও কাঁটা ভর্তি, শাহেদ ভাই!'

'হুঁ।'
'আপনি কি আপাকে বিয়ের ব্যাপারে সব ঠিকঠাক করে ফেলেছেন?'
'কেন বল তো?'
'এমনি জিজ্ঞেস করছি।'
শাহেদ চুপ করে রইল। শ্রাবণী বলল, 'সব ঠিকঠাক করে ফেললে ভিন্ন কথা। ঠিকঠাক করে না ফেললে নিজেকে ভালো করে জিজ্ঞেস করুন— আপার জন্যে আপনি কতখানি ভালবাসা আলাদা করে রেখেছেন?'
শাহেদ বলল, 'ঐ প্রসঙ্গ থাক।'
'ঐ প্রসঙ্গ থাকবে কেন? আপনার কি মনে হয় না ঐ প্রসঙ্গটা খুব জরুরি।'
'আজ থাক। অন্য সময় আলাপ করব। আজ হৈচৈ করতে এসেছি। চল হৈচৈ করি।'
শ্রাবণী কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, 'আপাকে ফেলে এসে আপনি যে আমার সঙ্গে হৈচৈ করছেন, আপনার খারাপ লাগছে না?'
'আচ্ছা শ্রাবণী, তুমি কী শুরু করেছ বল তো! চা দাও। চা খাই।'
শ্রাবণী বলল, 'আসুন, গান শুনতে শুনতে চা খাই।'
শাহেদ বিস্মিত হয়ে বলল, 'তুমি গান গাইবে? গান জান তুমি?'
'মোটামুটি জানি, তবে না জানার মতোই। দরজা বন্ধ করে যখন গান গাই তখন মনে হয়— ভালোই তো হচ্ছে—খোলামাঠে গান কেমন লাগবে জানি না। রিস্ক নিতে চাচ্ছি না। আমি কাঁধের ঝোলায় একটা ক্যাসেট প্লেয়ার নিয়ে এসেছি। আপনার কি ধরনের গান পছন্দ? রবীন্দ্রসংগীত না ধুম-ধাড়াক্কা। আমার কাছে সবই আছে।'
শ্রাবণী গান দিয়ে দিল। অরুন্ধতী হোমের গলায় অপূর্ব গান—
ওকে ধরিলে তো ধরা দেবে না—
ওকে দাও ছেড়ে দাও ছেড়ে
একি খেলা মোরা খেলেছি, শুধু নয়নের জল ফেলেছি—
.
শাহেদ অবাক হয়ে দেখল, শ্রাবণীর চোখ ভিজে উঠেছে। সে অবাক হয়ে শ্রাবণীর দিকে তাকিয়ে রইল। কী অপূর্ব লাগছে এই শ্যামলা মেয়েটিকে!
শ্রাবণীর চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে পানি পড়ছে। সে অশ্রুজল লুকানোর কোনো চেষ্টা করছে না।

১১

জাহানারার ঘর অন্ধকার। তিনি দরজা-জানালা সব নিজের হাতে বন্ধ করেছেন। নবনী অন্ধকার ঘরে তার মার পাশে বসে আছে। তার কেমন ভয় ভয় লাগছে। তার মনে হচ্ছে, মা যেন ঘোরের জগতে চলে যাচ্ছেন। কথাবার্তা ছাড়া ছাড়া। মার মধ্যে কি কোনো পাগলামি ভর করেছে? কেমন তীক্ষ্ণ গলায় কথা বলছেন। যেন মা না, অন্য কেউ। নবনী বলল, 'এরকম করছ কেন?'

'তোকে একটা কথা বলব।'

'এমন কী কথা যে বলার জন্যে দরজা বন্ধ করতে হবে?'

'কিছু কথা আছে অন্ধকারে বলতে হয়। আলোতে বলা যায় না।'

'মা, আমি শুনতে চাচ্ছি না।

'তোকে শুনতে হবে।

'মা প্লিজ, আমি শুনতে চাচ্ছি না। আমার ভয় লাগছে।'

জাহানারা তীব্র গলায় বললেন, 'ভয় আমারও লাগছে। জীবনটা কাটিয়ে দিয়েছি ভয়ে ভয়ে। আর ভালো লাগছে না। আমি মুক্তি চাই। আমি আরাম করে ঘুমাতে চাই। কত রাত আমি ঘুমাই না তুই জানিস?'

'মা তুমি শুয়ে থাক। আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। আমি তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি।'

'তুই আমাকে ঘুম পাড়াবি, তুই?'

জাহানারা উঠে বসলেন। হড়হড় করে বিছানা ভাসিয়ে বমি করলেন। নবনী ভয় পেয়ে ডাকল—'মিলু বুয়া! মিলু বুয়া!'

জাহানারা কঠিন গলায় বললেন, 'ওকে এখন ডাকিস না। আমার কথা শেষ হোক, তারপর ডাকবি। শোন নবনী, ঐ মিলুর বাচ্চা কাচ্চা কেন হয় না জানিস? এগার বছর হল বিয়ে হয়েছে। কোনো ছেলেপুলে নেই। হবেও না কোনো দিন। কেন তুই শোন।'

'মা প্লিজ!'

'খবরদার প্লিজ বলবি না। খবরদার বললাম, আমার কথা শেষ করতে দে। মিলুর যখন সতের বছর বয়স তখন ওর পেটে বাচ্চা এসে গেল। তোর অতি ব্যস্ত বাবা নিজে তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল। বাচ্চা নষ্ট হল। তোর বাবার বুদ্ধি তো খুব বেশি। কাজেই বুদ্ধি করে লাইগেশনও করিয়ে আনল। এতে খুব সুবিধা—ছেলেপুলে হবার ভয় নেই। যন্ত্রণা নেই। বুঝতে পারছিস কিছু? কাল রাতের কথা শুনবি? কাছে আয়, কানে কানে বলি। মিলু আমার মাথা টিপে দিচ্ছিল। তোর বাবা তাকে আমার ঘর থেকে ডেকে নিয়ে গেল। কোনো রকম লজ্জা নেই, কোনো সংকোচ নেই। স্বাভাবিক একটা ব্যাপার। এই স্বাভাবিক ব্যাপার রাতের পর রাত, বছর পর বছরের চলছে। আমরা যখন বাইরে কোথাও যাই, মিলুকে সঙ্গে নিতে হয়। নবনী, আমার কথা বুঝতে পারছিস রে বোকা মেয়ে?'

জাহানারা আবারো হড়হড় করে বমি করলেন। নবনী ফিসফিস করে বলল, 'মা তুমি অসুস্থ।'

জাহানারা বললেন, 'হ্যাঁ আমি অসুস্থ। বাকি সবাই সুস্থ। তোর বাবা সুস্থ, তুই সুস্থ, শ্রাবণী সুস্থ। শুধু আমি বাদ পড়ে আছি। শুধু আমি। আমার চিকিৎসা দরকার। আমার খুব ভালো চিকিৎসা দরকার।'

'মা প্লিজ!'

'খবরদার, আমার কাছে আসবি না। যা দরজা খোল। তোর বাবাকে ডেকে আন, পুলিশ দুটাকে ডেকে আন। আনসারদের ডেকে আন। চেয়ারম্যান সুরুজ মিয়াকে আন। যে যেখানে আছে সবাইকে ডাক। আমি সবাইকে বলব। জনে জনে ডেকে বলব। তারপর ঘুমাব। আরাম করে ঘুমাব। ঘুমে আমার চোখ বন্ধ হয়ে আসে কিন্তু আমি ঘুমাতে পারি না।'

দরজায় শব্দ হচ্ছে। মিলু ক্ষীণ গলায় ডাকল–'আম্মা দরজা খুলেন। কী হইছে আম্মা?'

জাহানারা চাপা গলায় বললেন, 'মেয়েটা আমারে আম্মা ডাকে। মিষ্টি করে আম্মা ডাকে।

দরজা খুলে দে নবনী। আমার মেয়ের জন্যে দরজা খুলে দে।'

নবনী দরজা খুলে বের হয়ে এল। তার সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে। নবনীর পেছনে পেছনে জাহানারা বের হয়ে এলেন। উঁচু গলায় বললেন–'তোমরা সবাই কোথায় –আমার কথা শুনে যাও। আস সবাই। আস। খুবই মজার গল্প। হি-হি-হি।'

১২

নবনী একা একা বটগাছের গুঁড়ির বাঁধানো অংশে বসে আছে। রাত অনেক হয়েছে। আকাশে চাঁদ উঠেছে। চারদিকে সুন্দর জোছনা। নবনীর মনে হচ্ছে সে একটা দুর্গের ভেতর আছে। বৃক্ষের দূর্গ। এই দুর্গ ভেদ করে কেউ তার কাছে আসতে পারবে না। ক্রমাগত ঝিঁঝি ডাকছে। শীতের বাতাস বইছে। নবনীর ঘুম পাচ্ছে। তার খুব ইচ্ছে করছে এখানে ঘুমিয়ে পড়তে। এত ক্লান্তি লাগছে। কিন্তু তার মন শান্ত। মনে হচ্ছে তার কোনো দুঃখবোধ নেই। সে কি নিজেই গাছ হয়ে যাচ্ছে? গাছদের জীবনে নিশ্চয়ই কোনো তীব্র দুঃখবোধ থাকে না।

'আপা!'

নবনী তাকাল। শ্রাবণী এসেছে। সে আসবে নবনী জানত। সে শ্রাবণীর জন্যেই অপেক্ষা করছিল। শ্রাবণী এসে বসল বোনের পাশে। নবনী বলল, 'দেখেছিস কী সুন্দর!'

শ্রাবণী বলল, 'হ্যাঁ।'

নবনী বলল, 'ইংরেজির ঐ অধ্যাপক ভদ্রলোকের মতো আজ সারারাত আমি এখানে বসে জোছনা দেখব।

শ্রাবণী বলল, 'আমিও দেখব। আমি তোমার জন্যে চাদর নিয়ে এসেছি, আপা। নাও, চাদরটা গায়ে দাও।'

নবনী কোনো আপত্তি করল না। চাদর গায়ে দিল। শ্রাবণী বলল, 'আপা শোন, আমার দিকে তাকাও। আমার দিকে তাকিয়ে একটা কথা শোন।'

নবনী তাকাল। শ্রাবণী খুব সহজ স্বরে বলল, 'এই পৃথিবীতে তোমার চেয়ে বেশি আমি কাউকে পছন্দ করি না। তুমি যে কত ভালো একটা মেয়ে তা শুধু আমি জানি। আর কেউ জানে না। কেউ কোনোদিন জানবেও না। আমি কি তোমাকে কষ্ট দিতে পারি আপা? ভুলেও ভেব না তোমার প্রিয়জনকে আমি কেড়ে নেব। তোমার যে প্রিয় সে আমারও প্রিয়।'

নবনী ছোট্ট করে নিশ্বাস ফেলল।

শ্রাবণী বলল, 'আমি তোমার জন্যে অসম্ভব সুন্দর একটা জীবন চাই। এমন সুন্দর জীবন, যা শুধু গল্পে উপন্যাসে পাওয়া যায়। আমি কখনো চাই না, তোমার জীবনটা মার মতো হয়। আমি যা করেছি এই জন্যেই করেছি। তোমার যত ভ্রান্তি ছিল সব দূর করে দিলাম। এমনিতে তুমি কিছু বুঝতে পারছিলে না। কাজেই খুব কঠিনভাবে তোমাকে বুঝিয়ে দিলাম।

'মার ব্যাপারটা তুই জানতি?'

'কেন জানব না, আপা? আমার অনেক বুদ্ধি।'

নবনী কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আমি এত বোকা হয়েছি কেন রে শ্রাবণী? আল্লাহ্ কেন আমাকে এত বোকা করে বানাল?'

নবনী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। শ্রাবণী তার বোনকে শক্ত করে দুহাতে জড়িয়ে ধরে রেখেছে। শ্রাবণীকে এখন একটা বৃক্ষের মতোই লাগছে। যেন সে বোনের চারদিকে কঠিন দেয়াল তুলে দিয়েছে। যেন এই দেয়াল ভেদ করে পৃথিবীর কোনো মালিন্য নবনীকে স্পর্শ করতে না পারে। আকাশ থেকে জোছনা গলে গলে পড়ছে। শীতের বাতাসে যেন সেই জোছনা ভাসতে ভাসতে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। শ্রাবণী ফিসফিস করে বলল, 'কাঁদে না আপা। কাঁদে না।'

সমাপ্ত